ইসলামী বিপ্লব
সংগঠন
ও
পরিকল্পনা

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী

ইসলামী বিপ্লব
সংগঠন ও পরিকল্পনা

অধ্যাপক মুহম্মদ ইউসুফ আলী

ইসলামী বিপ্লব : সংগঠন ও পরিকল্পনা
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী

প্রকাশক
নেছার উদ্দীন মাসুদ
শহীদ স্মৃতি প্রকাশনী
৪৫১ মীর হাজীর বাগ, ঢাকা-১২০৪

প্রথম প্রকাশঃ
অগ্রহায়ন—১৩৯৫
রবিউস সানী—১৪০৯
ডিসেম্বর—১৯৮৮

পরিবেশক :
প্রীতি প্রকাশন
১৯১ বড় মগবজার ঢাকা ১২১৭

মুদ্রণ :
প্রমিজ প্রিন্টার্স
১৭ ডি, আই, টি রোড
মালিবাগ, চৌধুরী পাড়া
ঢাকা-১২১৭

মূল্যঃ নিউজ ১০.০০
সাদা ১৬.০০

Islami Biplab—Shongathan O Paricolpona. by Prof. Md. Yousuf Ali. Price : White 16.00 News 10.00

بسم الله الرحمن الرحيم

পেশ কালাম

সংগঠন, পরিকল্পনা ও ইসলামী বিপ্লব—ইসলামী আন্দোলনের পথে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পরিচিত নাম।

সংগঠন—একটি মৌলিক বিষয়। বস্তুতঃ এর গুরুত্বের পাওনা খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যথার্থ ভাবে পায়নি বলেই আমার ধারণা। সাম্প্রতিক কালে এর উপর দু'একটি বই রচিত হয়েছে। আসলে সংগঠনের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা, এর উপাদান, এর দুর্বলতা ও প্রতিকার—এসব বিষয়ে আলোচনা অত্যন্ত জরুরী।

পরিকল্পনা — সংগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। পরিকল্পনার যথার্থ প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের উপর সাংগঠনিক অগ্রগতি অনেক খানি নির্ভরশীল।

সর্বোপরি ইসলামী বিপ্লব সাধন ইসলামী আন্দোলনের মূল টার্গেট। এ টার্গেট অর্জনের জন্য যে সব শর্তাবলী জরুরী তাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এ তিনটি বিষয়ে তিনটি স্বতন্ত্র পুস্তকই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের চাহিদা হওয়া স্বাভাবিক। বর্তমান পুস্তিকায় তিনটি বিষয়ের সার সংক্ষেপই পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আগামীতে এসব বিষয়ে স্বতন্ত্র বই রচনার আশা রইল। আলোচ্য বিষয়ের উপর পাঠকবর্গ ও সুধী মহলের মূল্যবান পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহন করা হবে।

—লেখক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
সংগঠন, পরিকল্পনা ও ইসলামী বিপ্লব	৫
সংগঠন	৫
নেতৃত্ব কাঠামো গড়ে তোলা ও চালু রাখা	৯
পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন	১০
পরিকল্পনা কি ?	১১
জামায়াতের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	১২
পরিকল্পনা গ্রহণ	১৩
কিছু স্থায়ী বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ	১৪
দাওয়াত ও তাবলীগ	১৪
সংগঠন ও প্রশিক্ষণ	১৬
সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কার	১৭
রাজনৈতিক কার্যক্রম	১৭
পরিকল্পনার বাস্তবায়ন	১৭
সংগঠনের গুরুত্ব	২০
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংগঠনের বৈশিষ্ট্য	২১
রাসূলুল্লা (সঃ) সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	২২
সংগঠন ও আন্দোলন	২৪
একক উদ্দেশ্য	২৬
নেতৃত্ব	২৭
কর্মী বাহিনী	৩২
কর্মসূচী	৩৩
সংগঠনের মজবুতী আসবে কিভাবে	৩৫
সংগঠনের মজবুতির লক্ষণ	৪১
ইসলামী বিপ্লব	৪২
আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ইসলামী বিপ্লব	৪৫
ইসলামী বিপ্লবের শর্ত	৫০
ইসলামী বিপ্লবের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত— —আল্লাহর সাহায্য	৫৪

সংগঠন, পরিকল্পনা ও ইসলামী বিপ্লব

বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লবের আওয়াজ উঠেছে। ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনশক্তি, ইসলামের মুবাল্লেগ এমনকি মুসলিম রাষ্ট্রনায়কগণও ইসলামের আওয়াজ তুলছে। অপরদিকে ইসলামের ছোট-বড় শত্রুরাও হুঁশিয়ার এবং তৎপর। ইসলাম তার সত্যিকার পরিচয় ও ভূমিকা নিয়ে দুনিয়ার কোথাও কায়েম না হোক—এটাই বিরোধী মহলের কাম্য। এমতাবস্থায় ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে অত্যন্ত হুঁশিয়ারী ও বিজ্ঞতার সাথে আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী বিপ্লব সাধন হলো চূড়ান্ত লক্ষ্য। এর জন্য মৌলিক ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হলো একটি মজবুত সংগঠনের। ইসলামী বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে সংগঠন তার জনশক্তি ও সম্পদকে যথার্থ পরিকল্পনার ভিত্তিতে ব্যবহার করতে পারলে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়। তাই সংগঠন, পরিকল্পনা ও ইসলামী বিপ্লব পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এসব বিষয়ের প্রয়োজনীয় বিশ্লেষনই এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়।

সংগঠন

ইংরেজী Organisation ও আরবী 'تنظيم' তানযীম শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো সংগঠন। جماعة জামায়াত দল বা পার্টি শব্দ দ্বারাও সংগঠনের অর্থ প্রকাশ করে। আন্দোলন ও সংগঠন এক জিনিষ নয়। আন্দোলন মানে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্ঠা ও সাধনা ইংরেজিতে যাকে বলে Movement। আন্দোলন বা চেষ্টা সাধনার জন্য নিয়োজিত যে সংস্থা তার নাম সংগঠন। অর্থাৎ চেষ্টা সাধনার নাম আন্দোলন এবং চেষ্টা সাধনা পরিচালনা করে যেই সংস্থা তার নাম সংগঠন।

অর্থনীতিতে যেমন সংগঠন মানে অন্যান্য উৎপাদন উপাদানকে যে কাজে লাগায়, যে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং যে ঝুঁকি গ্রহণ করে—বিপ্লবের ক্ষেত্রেও তেমনি যে সংস্থাটি জনশক্তিকে সংগ্রহ করে ও কাজে লাগায়, উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ঝুঁকি মোকাবেলা করে, সে সংস্থাটির নাম সংঠগন্।

সংগঠনের জন্য ৪টি উপাদান জরুরী।

(১) একক উদ্দেশ্য (২) নেতৃত্ব (৩) কর্মী বাহিনী (৪) কর্মসূচী।

১। একক উদ্দেশ্য

সংগঠনের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন হলো সংশ্লিষ্ট জনশক্তির একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকতে হবে। একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্যই তারা সমবেতভাবে কাজ করবে। এ যেন একটি মেশিন, যার কল-কব্জা বিভিন্ন ধরনের কিন্তু সবাই মিলে একটি মাত্র উৎপাদন সম্পন্ন করে থাকে।

আন্দোলনের গতি প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কোন কল-কারখানার শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে আন্দোলন হতে পারে, পাকিস্তান বা বাংলাদেশ সৃষ্টির মত দেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আন্দোলন হতে পারে অথবা হতে পারে কোন আদর্শ কায়েমের উদ্দেশ্যে আন্দোলন—মোটকথ, সংগঠনের প্রথম উপাদান হলো একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

বহু লোক একত্র হলেই সংগঠন হয় না। যেমন একটি বাজার— এখানে বহু লোক আসে স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নিয়ে—উদ্দেশ্যের কোন ঐক্য বা এককেন্দ্রিকতা নেই। তাই এটা সংগঠন নয়। অথচ এই বাজারের জন্য গঠিত কমিটি বাজার উন্নয়নের একক উদ্দেশ্যে গঠিত বলে উক্ত কমিটি একটি সংগঠন।

সেই অর্থেই জামায়াতে ইসলামী একটি সংগঠন। কেননা তার মধ্যে একক উদ্দেশ্য রয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে গঠনতন্ত্র বলে "বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা, মানব জাতির কল্যান সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সঃ) প্রদর্শিত দ্বীন [ইসলামী জীবন বিধান] কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করাই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য"।

যারা এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে একমত হন এবং নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই বানিয়ে নেন কেবল মাত্র তাদেরকেই

জামায়াতে ইসলামীর রুকন বা সদস্য করা হয়। তাই জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যও লক্ষ্যের ঐক্য পূর্ণভাবে পালিত।

২। নেতৃত্ব

সংগঠনের জন্য দ্বিতীয় যে উপাদান জরুরী তা হলো নেতৃত্ব। বহু লোক মিলে কোন একক উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে তাদের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচন বা নির্ধারণ একান্তভাবে জরুরী। প্রকৃত পক্ষে সংগঠনের প্রধান চালিকা শক্তিই হলো নেতৃত্ব। সংগঠনের শৃংখলা বিধান, নিয়ম নীতি অনুসরণ, কাজে-কর্মে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ— ইত্যাদি পদক্ষেপ নেতাকেই নিতে হয়।

ইসলামী আন্দোলনের অতীত ইতিহাস থেকে দেখা যায় নেতাকেই মূল আহবানকারীর ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। যুগে যুগে নবী রাসুলগণের নেতৃত্বেই আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তাঁরাই আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। পরবর্তী যুগেও নেতাকেই দা'য়ী ইলাল্লাহর—আল্লাহর দিকে আহবান কারীর ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও সংগঠনে নেতার ভূমিকা প্রধান হয়ে থাকে।

জামায়াতে ইসলামীর মধ্যেও রয়েছে নেতৃত্বের কাঠামো। এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী মরহুম দা'য়ী ইলাল্লাহর ভূমিকা পালন করেছেন এবং অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জামায়াতের নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। এখন বিভিন্ন দেশে গঠণতন্ত্র মোতাবেক জামায়াতের নেতৃত্ব নির্ধারিত হচ্ছে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে। কেন্দ্রের আমীরে জামায়াত থেকে নিয়ে ইউনিয়ন আমীর পর্যন্ত এক নেতৃত্ব কাঠামো গড়ে উঠেছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে উপজিলা থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত আমীর না হলে সংশ্লিষ্ট নাযেমগণ নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

উদ্দেশ্যের যেমন অটুট ঐক্য প্রয়োজন, নেতৃত্বের তেমন বলিষ্ঠতা ও চারিত্রের সাবলীলতা দরকার মজবুত সংগঠন গড়ে তোলার জন্য।

৩। কর্মী বাহিনী

নেতার কাজ হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও হুকুম প্রদান। নেতাকে মানা ও হুকুম পালনের জন্য সংগঠনের তৃতীয় উপাদান হলো কর্মী বাহিনী। সংগঠনের অবশ্য একটি কর্মী বাহিনী থাকবে যা সক্রীয়ভাবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে। সংগঠনে দেশের আইনের কোন বাধন নেই, এখানে রয়েছে নৈতিক বন্ধন। তাই কর্মীগণ যদি সেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে কাজে এগিয়ে আসেন, তাহলেই প্রকৃত পক্ষে তারা কর্মী হিসাবে গণ্য। কর্মীদের জোর করে কাজ করানো সম্ভব নয়। তাই সেচ্ছায় ও সতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণকারী কর্মী বাহিনী সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ইসলামী আন্দোলনে নবী রাসুলগণ যে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেখানে একটি কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই কাজ করা হয়েছে বিভিন্ন যুগে। তাঁরা ঘোষণা করেছেন "আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ও অহিপ্রাপ্ত তাই আমাদের অনুগত্য কর 'فاطيعون'"। ফাআতেউন রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর কর্মী বাহিনী সাহাবায়ে কেরাম নির্দ্ধিধায় ঘোষণা দিয়েছেন—سمعنا و اطعنا "আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম"।

জামায়াতে ইসলামীর কর্মী বাহিনী সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন ইউনিটে ইউনিটে তারা বৈঠকে মিলিত হন, সংগঠনের ডাকে তারা সাড়া দেন।

৪। কর্মসূচী

সংগঠনের চতুর্থ উপাদান হলো কর্মসূচী। কোন উদ্দেশ্য হাসেলের জন্য একটি কর্মসূচীর অবশ্য প্রয়োজন। কর্মসূচী মানে কাজ করার নিয়ম পদ্ধতি। কোন সঠিক নিয়ম পদ্ধতি ছাড়া কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়া যায় না। সংগঠন পরিচালনার জন্য নিয়ম পদ্ধতির প্রয়োজন যা গঠণতন্ত্রে লেখা থাকে। এছাড়া স্থায়ী কর্মসূচী ও বার্ষিক পরিকল্পনাও কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত। কোন উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য নেতাও কর্মী থাকা সত্ত্বেও সঠিক কর্মসূচী না থাকলে তা সংগ-

ঠনে পরিণত হবেনা। তাই সংগঠন মানে দাঁড়ায়—কোন একক উদ্দেশ্য হাসেলের জন্য একটি যথার্থ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন যা রূপ লাভ করবে নেতা ও কর্মীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

সংগঠনের উপাদান সম্পর্কে সহজ ভাষায় মনে রাখার মত করে বলা যায়—নীতি—নেতা—কর্মী—কর্মসূচী।

সংগঠনের বাস্তব উদাহরণ নামাযের জামায়াত। এখানে অংশগ্রহণকারী সকলের একই উদ্দেশ্য—আল্লাহকে খুশী করা। একজন নেতা বা ইমাম রয়েছেন এবং ইমামকে অনুসরণ করছেন মুক্তাদিবৃন্দ। এর মানে নামাজ আদায়ের রয়েছে একটি নির্দিষ্ট কর্ম পদ্ধতি। তাই নামাযের জামায়াত হলো সংগঠনের আদর্শ নমুনা।

তেমনিভাবে জামায়াতে ইসলামী একটি সংগঠন। এতে অংশগ্রহণকারী লোকদের রয়েছে একক উদ্দেশ্য, তার রয়েছে একটি নেতৃত্ব কাঠামো এবং একটি কর্মী বাহিনী। সর্বোপরি রয়েছে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি। জামায়াত একটি গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং তার রয়েছে ৪ দফা স্থায়ী কর্মসূচী। এ ছাড়া প্রতি বছর জামায়াত তার বাস্তব কাজের ভিত্তিতে বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে।

সংগঠনকে মৌলিকভাবে যে সব কাজ করতে হয় তা হলো নেতৃত্ব কাঠামো গড়ে তোলা ও চালু রাখা, সর্বস্তরের বৈঠকাদি চালু রাখা, সীদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

নেতৃত্ব কাঠামো গড়ে তোলা ও চালু রাখা

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আমীরে জামায়াত

প্রতি তিন বছর পর আমীরে জামায়াতের নির্বাচন হয়। সকল রুকনদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন। তাকে সহযোগীতা করার জন্য গঠিত হয় কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও কেন্দ্রীয় কার্মপরিষদ। জিলা, উপজিলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ঠ রুকনদের রায়ের ভিত্তিতে আমীরে জামায়াত আমীরের নিয়োগ দান করেন। যে সব ক্ষেত্রে আমীর করার

অবকাশ নেই সে সব ক্ষেত্রে জিলা আমীর নায়েম নিয়োগ করেন। এভাবে আমীরে জামায়াত থেকে ইউনিট নায়েম পর্যন্ত নেতৃত্বের এক চেইন জামায়াতে গড়ে উঠেছে।

গঠনতন্ত্র মোতাবেক বিভিন্ন স্তরে মজলিসে শূরা, কর্মপরিষদ গঠিত হয় অথবা সাংগঠনিক টীম গড়ে তোলা হয় দায়িত্ব পালনের জন্য। কেন্দ্র থেকে ইউনিট পর্যন্ত বিভিন্নস্তরে মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ও সাপ্তাহিক বৈঠকাদি চালু রয়েছে। সাংগঠনিক এইসব বৈঠকাদি চালু রাখাও সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সংগঠনের এই গোটা কার্যক্রমের মধ্যে পরিকল্পনা গ্রহন ও তার বাস্তবায়ন হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে পরিকল্পনার উপর আলোচনা পেশ করছি।

পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

ইসলামী আন্দোলন যখন বিস্তার লাভ করে, কাজের পরিধি তখন বেড়ে যায়। ফলে মূল সংগঠনের সাথে অংগ সংগঠন, পার্শ্ব সংগঠন ও সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে অনেক কাজ আঞ্জাম দেয়া হয়। তাই ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপক কাজের লিখিত সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা অনেক ক্ষেত্রে নেয়া যায় না। কিন্তু মূল সংগঠনের কার্যক্রমের পরিকল্পনা নেয়া অপরিহার্য।

পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সীমিত শক্তি ও সম্পদ দ্বারা সর্বাধিক ফল লাভ। সংগঠনের অধীন যা সম্পদ ও শক্তি আছে তা যদি সুপরিকল্পিত ভাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে বেশী ফল পাওয়া যাবে এটা নিশ্চিত।

পরিকল্পনাহীন কাজ মানে এ কাজের কোন টার্গেট বা উদ্দেশ্য নেই। অর্থাৎ উদ্দেশ্য বিহীন কাজ। যে কাজ উদ্দেশ্য বা টার্গেট বিহীন সে কাজের কোন হিসাব নিকাশ হয় না ফলে সে কাজের কোন অগ্রগতিও আশা করা যায় না।

পরিকল্পনা একটি technical বিষয়। সংগঠন পরিকল্পনায় এ tecnnical বিষয়গুলো বুঝে নিয়ে সুন্দর ও যথার্থভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

ইসলামী বিপ্লবের উদ্দেশ্য শুধু মাত্র ক্ষমতা দখল বা ক্ষমতার হাত বদল নয় বরং সমাজ কাঠামোর এক বিপ্লাবিক পরিবর্তন। সমাজ কাঠামোর এই পরিবর্তন সাধন মানেই বিপ্লব ঘটানো। একাজ অনেক বিরাট কাজ। লিখিত ও অলিখিত পরিকল্পনা ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়।

পরিকল্পনা কি ?

পরিকল্পনার সূচনা হয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে—সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায়। দেশের গোটা উৎপাদন উপায়কে রাষ্ট্রের করায়ত্ব করার পর ঐ উৎপাদন উপায় ও সম্পদের দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরবর্তী পর্যায়ে পুঁজিবাদী দেশেও রাষ্ট্রীয় ও প্রাইভেট সেক্টরের সম্পদের পাঁচশালা, দশশালা পরিকল্পনা গৃহিত হয়।

পরিকল্পনা মানে ধাপে ধাপে কোন লক্ষ্যে পৌঁছার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ প্রাপ্ত উপায় উপকরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি সময়ে একটি মাত্রায় পৌঁছার টার্গেট গ্রহণ ও লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা। তাই পরিকল্পনার জন্য তিনটি জিনিস অপরিহার্য।

(১) সময় সীমা নির্ধারণ—দশশালা পাঁচশালা, বার্ষিক।
(২) উপায় উপকরণের যথার্থ রিপোর্ট, প্রয়োজনীয় সার্ভে ও হিসাব নিকাশ।
(৩) লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ।

১। পরিকল্পনার জন্য সময় সীমা নির্ধারণ এক অপরিহার্য প্রয়োজন। সময়সীমা নির্ধারণ ছাড়া কোন পরিকল্পনা হতেই পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ২৫ শালা ১০ শালা পরিকল্পনাও নেয়া হয়, তবে সাম্প্রতিক কালে পাঁচশালা পরিকল্পনাই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পাঁচশালা পরিকল্পনাকে আবার বার্ষিক পরিকল্পনায় বিভক্ত করা হয়। প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক উত্থান পতনের কারনে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর করা যায় না।

অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী, কিন্তু অলিখিত পরিকল্পনা ও থাকতে পারে। কিন্তু লিখিত পরিকল্পনা বার্ষিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দেশের রাজ-

নৈতিক উত্থান পতনের প্রেক্ষিতে এটাই সবচে যথার্থ প্রমানিত হয়েছে। অনেক সময় ঘটনাচক্রের কারণে এ বার্ষিক পরিকল্পনাও ব্যহত হয়। পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্যই এমনটি হয়। যাই হোক, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মূল সংগঠনের বার্ষিক পরিকল্পনাই নিয়ে আসছে।

২। উপায়-উপকরনের যথার্থ রিপোর্ট ও প্রয়োজনীয় সার্ভের ক্ষেত্রে সংগঠনের উপায় উপকরণ হলো জনশক্তি, বায়তুল মাল শক্তি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। জনশক্তির রিপোর্ট অনেক সময় যথার্থ হয় না গড়মিল থাকে। যথার্থ মানে কর্মী হয়নি তবু কর্মী হিসাবে গন্য করা, ইউনিট মান মোতাবেক সক্রীয় হয়নি তবু তাকে সক্রীয় গননা করা এ ধরনের রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিকল্পনা তৈরী করা হলে পরিকল্পনা অবশ্যি দুর্বল হবে, কারণ তার ভিত্তি দুর্বল। এ জন্য প্রয়োজন যথার্থ সার্ভের।

পরিকল্পনা গ্রহনের আগের মাস গুলিতে যথার্থ সার্ভের মাধ্যমে প্রকৃত কর্মী, সক্রীয় ইউনিট, বায়তুল মালের আয়-ব্যয় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঠিক চিত্র সংগ্রহ করতে হবে। কেবল মাত্র এটা সম্ভব হলেই একটি যথার্থ পরিকল্পনা প্রনয়ন সম্ভব।

৩। প্রাপ্ত উপায়-উপকরণ নির্দিষ্ট সময় শেষে কি ফল দিতে পারে বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা তা নির্ধারন করতে হবে। লক্ষ্য মাত্রা খুব অতিরঞ্জিত কিছু হওয়া যেমন ঠিক নয় তেমনি মোটেই কষ্টসাধ্য নয় এমন লক্ষ্য মাত্রা ধার্যও যথার্থ নয়। বাস্তবধর্মী লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে কাজে এগুতে হবে।

জামায়াতের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য

পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য হলো কর্মসূচী বাস্তবায়ন। জামায়াতে ইসলামীর ৪ দফা স্থায়ী কর্মসূচী রয়েছে।

সংক্ষেপে সে গুলো হলো ঃ

১। দাওয়াত ও তবলীগ।

২। সংগঠন ও প্রশিক্ষণ।

৩। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংশোধন ও সমাজসেবা।

৪। রাষ্ট্রীয় সংশোধন এবং সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব কায়েম।

পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্ভাব্য উপায়-উপকরন ভারসাম্যমূলক ভাবে যাতে ৪টি দফায় নিয়োজিত হয় সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

জিলা থেকে নিচের দিকে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ভারসাম্যমূলক চরিত্রের অভাব দেখা দিতে পারে। অতি সাংগঠনিক বা অতি রাজনৈতিক চরিত্রের অধিকারী নেতৃত্বকে ভারসাম্যমূলক পরিকল্পনা ভারসাম্য অবস্থায় আনতে সাহায্য করতে পারে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বার্ষিক পরিকল্পনা ৪ দফা-স্থায়ী কর্মসূচীর ভিত্তিকই হয়ে থাকে। তাই ভারসাম্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়।

পরিকল্পনা গ্রহণ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রথমে কেন্দ্রীয় ভাবে পুরো বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহন করে। পরিকল্পনা প্রনয়ন কালে বিগত বছর গুলোর পরিকল্পনা—তার লক্ষ্য ও টার্গেট অর্জন, প্রাপ্ত সাংগঠনিক রিপোর্ট ইত্যাদি বিশ্লেষন করা হয়। প্রথমে পরিকল্পনা কমিটি খসড়া তৈরী করে, কর্মপরিষদে খসড়া গৃহীত হলে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় পরিকল্পনা চুড়ান্ত করা হয়।

জিলা ও উপজিলা পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রনয়নের ক্ষেত্রেও একটি কমিটি প্রথমে খসড়া তৈরী করে। পরে সংশ্লিষ্ট সংস্থা আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে তা চুড়ান্ত রূপ দান করে। এ পর্যায়ে পরিকল্পনা করতে গিয়ে যে সব বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হয় তা হলো :

(ক) মূল (কেন্দ্রীয়) পরিকল্পনার লক্ষ্য ও দিক নির্দেশনা।

(খ) জিলার জনশক্তি ও সাংগঠনিক শক্তির যথার্থ রিপোর্ট।

(গ) সংশ্লিষ্ট এলাকার পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশগত অবস্থান।

(ঘ) পূর্বেকার বছর গুলোর অগ্রগতির হার।

এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিটি একটি পরিকল্পনা তৈরী করবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থা বিস্তারিত আলাপ আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করবে।

কিছু স্থায়ী বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ

৪ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে দফাওয়ারী কিছু স্থায়ী বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কিছু আলোচনা সংশ্লিষ্ট মহলের জন্য উপকারী হতে পারে। নিম্নে সে ধরনের দফাওয়ারী আলোচনা পেশ করা হল।

দাওয়াত ও তাবলীগ

প্রধানত ঃ ৪টি পদ্ধতি অবলম্বন করে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা যেতে পারে।

১। ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াতের মাধ্যমে।
২। বৈঠক ও আলোচনার মাধ্যমে।
৩। সাহিত্যের মাধ্যমে।
৪। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াত প্রদান

আন্দোলনের সক্রীয় জনশক্তি ব্যক্তিগত টার্গেট নিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াতের কাজ করে যেতে পারেন। দাওয়াতের ক্ষেত্রে এটি অবশ্যি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ ব্যাপারে উপজিলা পর্যায়ে বছরের শুরুতেই পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। প্রতি জনশক্তি প্রতি মাসে ৪ জন লোকের সাথে দাওয়াতী সাক্ষাৎ করবেন—এ হিসাবে টার্গেট নেয়া যেতে পারে। প্রতি মাসের পর্যালোচনায় দেখা যাবে টার্গেট কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে। ইউনিয়ন ও ইউনিটকেও এভাবে পরিকল্পনা ও টার্গেট নিয়ে কাজ করতে হবে।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াতী কাজের ব্যাপারে গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজও উল্লেখযোগ্য। প্রতিমাসে প্রতি ইউনিটে গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ হওয়ার কথা। এ হিসাবে প্রতিমাসে কতটি গ্রুপ বের হতে পারে তার টার্গেট উপজিলা পর্যায়ে নিয়ে উক্ত প্রোগ্রামটি বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে।

বৈঠক ও আলোচনার মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান

দাওয়াতী বৈঠকের আলোচনার মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান একটি উত্তম পদ্ধতি। এ পর্যায়ে ইউনিটের মাসিক বৈঠক (সাধারণ সভা), সুধী সভা, আলোচনা সভা, ওয়াজ মাহফিল. সিরাতুন্নবী মাহফিল, ইসলামী দিবস পালন, চা-চক্র, ইফতার পার্টি—এ সব প্রোগ্রাম উল্লেখযোগ্য। ইউনিট ও ইউনিয়নের পরিকল্পনাকে সামনে রেখে উপজিলা বছরের শুরুতেই এসব ব্যাপারে বিস্তারিত পরিকল্পনা নিতে পারে। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারলে ব্যাপক দাওয়াতী কাজ হতে পারে।

ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ

ইসলামী সাহিত্য দাওয়াতের এক বিরাট মাধ্যম। কেন্দ্রীয় ভাবে এসব ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হয়। নিম্নস্থ সংগঠনের দায়িত্ব হল এসব বই-পুস্তক সাধারণ মানুষের নিকট পৌছানো। এ পর্যায়ে যে সব পদক্ষেপ নেয়া জরুরী সেগুলি হল ঃ

ক) ব্যক্তিগত ভাবে বই রাখা ও পড়ানো।
খ) ইউনিট লাইব্রেরীতে বই রাখা ও পড়ানো।
গ) ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা।
ঘ) বই বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা।
ঙ) ব্যক্তিগত ভাবে বই বিক্রি।

এছাড়া নিজ নিজ এলাকার মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও পাবলিক লাইব্রেরী সমূহে কখন বই কেনা হয় সে ব্যাপারে সচেতন

থাকা দরকার। এসব পাঠাগারে বেশী বেশী আন্দোলনী বই সরবরাহের সনাথে সংশ্লিষ্ট কমিটি বা কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং সম্ভব হলে বই ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। চটি বইয়ের চাইতে অপেক্ষাকৃত দামী ও সহায়ক বই ব্যক্তিগতভাবে অনেক কর্মীর পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন। এ ধরনের বই এসব লাইব্রেরীর মাধ্যমে সংগ্রহ করে নেয়া যায়।

জিলা বা উপজিলা পর্যায়ে এই সব ব্যাপারে টার্গেট সহ পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। এসব ব্যাপারে অগ্রগতি হলে দাওয়াতী কাজ বৃদ্ধি পাবে নিঃসন্দেহে।

পত্র পত্রিকার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ

আন্দোলন সহায়ক দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে দেশের সচেতন জনগনের মধ্যে দাওয়াতী কাজ বৃদ্ধি পায়। তাই এসব পত্র-পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির টার্গেট নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহন করা যেতে পারে।

এ ছাড়া দাওয়াতী সপ্তাহ পালন, দাওয়াতী অভিযান পরিচালনা, কোন কোন ইউনিয়নে বা গ্রামে দাওয়াতী গ্রুপ প্রেরণ এসব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আলোকে পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে।

খ) সংগঠন ও প্রশিক্ষণ

সংগঠন পর্যায়ে জনশক্তির হারওয়ারী পরিকল্পনা জিলা ও উপজিলাকে নিতে হবে। রুকন, কর্মী ও সহযোগী সদস্যের টার্গেট ভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে হবে।

প্রশিক্ষন পর্যায়ে ইউনিট বা ইউনিয়ন ভিত্তিক টি, এস, এর পরিকল্পনা নিতে হবে উপজিলাকে। উপজিলা ও জিলা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবিরের পরিকল্পনা নিতে হবে জিলাকে।

গ) সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কার

সমাজসেবা পর্যায়ে উপজিলায় দাতব্য চিকিৎসালয়, এতিমখানা, আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। অবশ্য পরিকল্পনা বাস্তব মুখী হতে হবে। খরচের সাথে আয়ের ব্যবস্থাও পরিকল্পনায় নিতে হবে। ইউনিট বা ইউনিয়ন ভিত্তিক দু-একটা সমাজ সেবা মূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। বিধবা পুণর্বাসন, পুল বা সাকো নির্মান, রাস্তাঘাট মেরামত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান এ ধরনের এক বা একাধিক প্রোগ্রামের পরিকল্পনা নেয়ার টার্গেট ইউনিটকে দেয়া যেতে পারে।

ঘ) রাজনৈতিক কার্যক্রম

রাজনৈতিক কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট টার্গেট নিম্নস্থ সংগঠনের পক্ষে নেয়া কঠিন। কেন্দ্র ঘোষিত দিবসাদি পালন, জনসভা ইত্যাদি পদক্ষেপ নেয়ার কথা পরিকল্পনায় থাকতে পারে। অবশ্য প্রশাসানের সাথে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগের টার্গেট পরিকল্পনায় থাকা উচিত।

পরিকল্পনার লক্ষ্যের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য যে, কেন্দ্র থেকে যে লক্ষ্য নির্ধারন করা হয় তা সামগ্রিকভাবে গোটা সংগঠনেরই জন্য। এ জন্য বিভিন্ন স্তরে আলাদা আলাদা লক্ষ্য নির্ধারণ বা লক্ষ্যের হ্রাস বৃদ্ধির গবেষনায় নিম্নস্থ সংগঠনের নিয়োজিত না হওয়াই উচিৎ।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

সুন্দর করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহনই কিন্তু বড় কাজ নয়, বড় কাজ হলো পরিকল্পনার যথার্থ বাস্তবায়ন। আসলে পরিকল্পনা প্রণয়নতো করতে হবে বাস্তবায়নেরই লক্ষ্যে। এ জন্য কেন্দ্র থেকে উপজিলা পর্যন্ত পরিকল্পনার কপি সরবরাহ করা সম্ভবপর নয়। কারণ স্ব স্ব এলাকার

অবস্থা ও রিপোর্টের ভিত্তিতে নিজের পরিকল্পনা নিজেরই তৈরী করতে হবে। এর জন্য জনুতার ফর্মার মতো কোন ফর্মা নেই।

পরিকল্পনা নজরে রাখা

পরিকল্পনা গ্রহন করার পর যদি এর কপি যত্ন সহকারে ফাইলবন্দী করে রাখা হয়, সংগঠনিক কাজ-কর্মে পরিকল্পনা, তার টার্গেট ইত্যাদির কোন খোঁজ খবর রাখা না হয় তাহলে সুন্দর পরিকল্পনা কোনই ফল দিবেনা। যথার্থ ফল লাভের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনাকে সময় সময় দেখা, এর টার্গেট খেয়াল রাখা।

পরিকল্পনা পর্যালোচনা

পরিকল্পনার যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য সময় সময় পরিকল্পনার পর্যালোচনা একান্তভাবে জরুরী। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সার্বিকভাবে বছরে একবারের বেশী সুষ্ঠুভাবে পর্যালোচনা করা যায় না। কিন্তু জিলা পর্যায়ে প্রতি ৩ মাসে পরিকল্পনার পর্যালোচনা করা যেতে পারে। পর্যালোচনায় যে সব বিষয়ে এ তিন মাসে টার্গেট পূর্ণ হয়নি দেখা যাবে, সেগুলির প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করে টার্গেট পুনঃ নির্ধারণ করা যেতে পারে।

উপজিলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিমাসে পরিকল্পনার আলোকে কি কাজ হলো আর কি কাজ হলো না তা দেখা কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু এখনো যেন আমাদের সাংগঠনিক জনশক্তির উক্ত কাজগুলো রপ্ত হচ্ছে না। এজন্য যে বিষয় গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা দরকার তা হচ্ছে—

ক) মাসিক বৈঠকের পূর্বে পরিকল্পনার কপি দেখা যাতে সামনের মাসে বিশেষ করণীয় কি তা জানা থাকে।

খ) উর্ধতন দায়িত্বশীল নিম্নস্থ সংগঠনের পরিকল্পনা যথারীতি বাস্তবায়িত করছে কিনা তার সঠিক তদারক করা।

পরিকল্পনার বিশেষ করনীয়

পরিকল্পনার ব্যাপারে কেন্দ্র বিভিন্ন পরিশিষ্টের মাধ্যমে জিলা ও অধস্তন সংগঠনের করণীয় কি তা জানিয়ে দেয়। সেগুলো যথার্থ ভাবে পালন করা দরকার। তেমনি ভাবে জিলা অধস্তন সংগঠনকে প্রয়োজনীয় হেদায়াত পাঠাতে পারে, তা অনুসরন করা প্রয়োজন।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন রিপোর্ট প্রণয়ন

বছর শেষে জিলা ও উপজিলাকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রিপের্ট তৈরী করতে হয়। রিপোর্ট তৈরীর ব্যাপারটি পূর্ব থেকে খেয়াল রেখে প্রয়োজনীয় নোট রাখতে পারলে রিপোর্ট তৈরী সহজ হবে। এই রিপোর্ট তৈরী করে উর্ধতন সংগঠনে যেমন জমা দিতে হবে তেমনি নিজস্ব সংগঠনে তার বিস্তারিত পর্যালোচনা হওয়া দরকার। বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণ করে আসল তত্ব বের করতে হবে। যথেষ্ট সময় নিয়ে এর জন্য বিশেষ বৈঠক হওয়া প্রয়োজন।

সার্বিক রেকর্ড সংরক্ষণ

পরিকল্পনা প্রনয়ন, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক তথ্যাদির বার্ষিক রেকর্ড সংরক্ষন গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে। জনশক্তি ও সাংগঠনিক শক্তির বিভিন্ন আইটেমের বার্ষিক পরিসংখ্যান একটি রেজিষ্টারে যথারীতি সংরক্ষনের মাধ্যমেই এ কাজ করা যেতে পারে। পূর্ব থেকে এ ধরনের রেজিষ্টার না থাকলে চলতি বছর থেকে তা শুরু করা দরকার।

শেষ কথা

এটা মনে রাখতে হবে যে দায়িত্বশীলের মনোযোগ ও যোগ্যতার উপ-

রই নির্ভর করে যথার্থ ভাবে পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন। সব সময় খেয়াল রেখে সঠিক ভাবে তৎপরতা চালালে এবং যথারীতি পর্যালোচনা করে সময় মত পদক্ষেপ নিলে টার্গেট মোটামুটি অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়।

জামায়াতের ৪ দফা স্থায়ী কর্মসূচীর কারনে বিভিন্ন দফার কিছু স্থায়ী কাজও কার্যক্ষেত্রে চালু রয়েছে। যে কোন পরিস্থিতি ও পরিবেশে এগুলো চালু থাকা দরকার। টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াত, ইসলামী পুস্তকাদির মাধ্যমে দাওয়াত, মাসিক নিয়মিত বৈঠকাদি ও লোক তৈরীর কর্মসূচী—এ গুলো এ স্থায়ী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

সংগঠনের গুরুত্ব

ইসলাম দুনিয়াতে এসেছে আন্দোলনের আকারে এবং সংগঠনের মাধ্যমে। নবী রাসূলগণ দুনিয়াতে নবুয়ত বা রেসালাতের দায়িত্ব লাভের পর প্রথমেই দুনিয়াবাসীকে ডাক দিয়েছেন আল্লার বন্দেগীর দিকে—

’يقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره‘

‘হে আমার কওমের লোকেরা, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।’ মানব গোষ্ঠীর যারাই এ ডাকে সাড়া দিয়েছেন নবী রাসূলগণ তাদেরকে সংগঠিত করেছেন এবং অন্যায় ও বাতিলের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছেন এক আন্দোলন। সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদীরা ভাল করেই একথা বুঝতে পেরেছে যে এ ডাকের ভিত্তিতে একটি সমাজ গড়ে উঠলে তাদের স্বার্থ হবে ভূলুণ্ঠিত। ফলে তারা অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করে জনগণকে মিথ্যা শ্লোগানের মাধ্যমে হকের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। হক ও বাতিলের এ সংগ্রাম দুনিয়ার চিরন্তন সংগ্রাম। যুগে যুগে এ সংগ্রাম চলেছে, আজো চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে ধারাবাহিক ভাবে।

এ ক্ষেত্রে হককে সংগঠিত করার জন্য যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরামের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে সংগঠন, চলেছে সংগ্রাম-আন্দোলন, দুনিয়াবী জয় পরাজয়ের মহড়া চলেছে কিন্তু চূড়ান্তভাবে হকই জয়ী হয়েছে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ও নবুয়ত প্রাপ্তির পর মক্কাবাসীকে ডাক দিলেন আল্লাহর বন্দেগীর দিকে। মক্কার কোরাইশ মাতব্বর প্রধানগণ মজবুতভাবে এর বিরোধীতা করলেন। মক্কার সাধারণ মানুষও কোরাইশদের পক্ষই অবলম্বন করলো। কিন্তু এ ডাকে সাড়া দিতে থাকলো মক্কারই কিছু লোক, যাদেরকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সঃ) গড়ে তুললেন এক সংগঠন। দুনিয়ার ইতিহাসে এ সংগঠনটি ছিলো সবচেয়ে মজবুত ও নির্মল সংগঠন। এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর দিক নির্দেশনা আসলো বিশ্ব প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে—আর নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনীর নজির বিহীন উদাহরণ পেশ করলেন রাসুলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম।

সংগঠনের এ উত্তম উদাহরণকে বাদ দিয়ে তাই ইসলাম হতে পারে না। হযরত উমর (রাঃ) র ঘোষনার لا اسلام الا بالجماعة (লা ইসলামা ইল্লা বিল জামায়াত) তা সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আসলে নবী (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের ইসলামকে সংগঠন ছাড়া চিন্তা করা বা বুঝাই যেত না। কিন্তু কালক্রমে ইসলামকে সংগঠনের মাধ্যমে বুঝানোই হয়ে পড়েছে কঠিন।

রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সংগঠনের বৈশিষ্ট্য

(১) এ সংগঠন গড়ে উঠেছিল স্বয়ং আল্লাহ পাকের নির্দেশে এবং পরিচালিত হয়েছিল অহীর ভিত্তিতে। নবুয়তের গোটা ২৩ বছর রাসুলুল্লাহ (সঃ) অহীর ভিত্তিতেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। অহীর মাধ্যমে সংগঠনের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কাজের পর্যালোচনা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা এ সংগঠনকে حزب الله (হিযবুল্লাহ)বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

(২) এ সংগঠনের উদ্দেশ্য দুনিয়ার মানুষের কল্যান, আখেরাতের মুক্তি ও সাফল্য এবং আল্লার সন্তুষ্টি অর্জন—একথা কুরআন বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে দিয়েছে এবং সেভাবেই মোমিনদেরকে তৈরী করা হয়েছে। মোনাফিকদের আলাদা পরিচয় কুরআনের মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে। তাই একথা সুস্পষ্ট যে খাঁটি মোমিন ও একনিষ্ঠ মুসলমানই উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ।

২—

(৩) এ সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি গোটা বিশ্ব মানবতার মধ্যে অনন্য চরিত্রের অধিকারী। নেতৃত্বের সমস্ত গুণাবলী তার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বলবৎ ছিল।

(৪) এ সংগঠনের কর্মী বাহিনী—সাহাবায়ে কেরামগন এমন উদাহরণ পেশ করেছেন যা নজির বিহীন—না এর উদাহরণ অতীতে কোন দিন দেখা গিয়েছে, না পরবর্তী সময়ে কোন কালে দেখা দেয়ার সম্ভাবনা আছে। আল কুরআন তাদের বহুমুখী গুণ বর্ণনা করেছেন। এই সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে رضى الله عنهم ورضوا عنه 'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লার প্রতি সন্তুষ্ট।'

(৫) এ সংগঠনের কর্মসূচী নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়েছে মূলতঃ আল্লাহ-তায়ালা কর্তৃক। আল কুরআনের প্রত্যক্ষ হেদায়েতের ভিত্তিতেই তা পরিচালিত হয়েছে।

তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর এ সংগঠন—সর্বকালের, সর্বযুগের আদর্শ সংগঠন। আল্লাহ-তায়ালার প্রত্যক্ষ মদদে, আদর্শ নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পরিচালনায় সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে এ সংগঠনের কাজ চলেছিলো।

রাসুলুল্লা (সঃ)-এর সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লার নির্দেশে নির্যাতীত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তি ও মানবতার সার্বিক কল্যানের উদ্দেশ্যেই গড়ে তুলেছিলেন এ সংগঠন। এ সংগঠনের দায়িত্ব ছিল আল্লাহর দ্বীন কায়েম। আর দ্বীন কায়েমের জন্য অপরিহার্য—জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। তাই রাসূলুল্লার সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল জিহাদ ফি সাবিলিল্লার মাধ্যমে আল্লার দ্বীন কায়েম। আসলে আল্লার সন্তুষ্টি অর্জনের এটাই পথ। তাই সে সংগঠনের চুড়ান্ত লক্ষ্য ছিল আল্লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লার দ্বীন কায়েম। অর্থাৎ মানবতার মুক্তি ও কল্যান সাধনের উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) গড়ে তুলেছিলেন সে সংগঠন।

এ সংগঠনের স্বাভাবিক দাবী ছিল ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের মুলোৎপাটন। এর জন্য প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। রাসূলুল্লাহ

(সঃ) ১৩টি বছর মক্কায় একামতে দ্বীনের কাজ করলেন, প্রতিষ্ঠিত শক্তির বিরোধীতায় মোকাবেলায় দ্বীন কায়েম হল না। মদীনায় হিজরত করার প্রাক্কালে আল্লাহ তাকে দোয়া শিক্ষা দিলেন ঃ

رب اجعلی من لدنك سلطانا نصيرا

"হে আমার রব, আমাকে তোমার পক্ষ থেকে একটি সাহায্য কারী রাজশক্তি দান কর।"

তিনি হিজরত করে মদীনায় এসে ছোট আকারে হলেও সেই রাজশক্তি লাভ করলেন যা পরবর্তী পর্যায়ে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে মক্কায় এবং তারপর গোটা আরব উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনি ভাবে সংগঠন শক্তি রাজশক্তিতে পরিণত হল এবং তখনই ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হলো। আসলে রাজশক্তি ছাড়া ইসলামী আন্দোলনের টার্গেট হাসিল করা যায় না। তাই আল্লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, একামতে দ্বীনের মাধ্যমে মানবতার কল্যান সাধনের জন্য রাজশক্তি অর্জন একটি অপরিহার্য প্রয়োজন।

কুরআন সেদিকে ইঙ্গিত করেই সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে ঃ

ولتكم منكم امة يدعون الى الخير يامرون
بالمعروف وينهون عن المنكر

'তোমাদের মধ্যে অবশ্য এমন একটি দল থাকতে হবে যারা মানুষকে কল্যানের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।'

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মধ্যে এই যে 'আদেশ ও নিষেধ' (আমর ও নেহি) এর পেছনে অবশ্য ক্ষমতা থাকা দরকার। ক্ষমতাহীনের আদেশ নিষেধ কেউ মানেনা।

রাসুলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের সময়কালে সংগঠন রাষ্ট্রীয় শক্তিতে পরিনত হয়েছিল, সংগঠনই আন্দোলন পরিচালনা করে ইসলামকে সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সংগঠন ছিল ইসলামী কাফেলার জীবন্ত ও মূর্ত প্রতীক।

খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় শক্তি একই সাথে চলে কিন্তু তারপর বিশেষ করে ইয়াজিদের সময় থেকে সংগঠনের

পদবী 'আমীরুল মোমিনীন' রাষ্ট্রীয় শক্তির সাথে থাকলেও বাস্তবে সংগঠনের অস্তিত্ব থাকে না। রাষ্ট্র ও দ্বীন আলাদা হয়ে যায়। সংগঠন না থাকার কারনে আন্দোলনও থাকেনা, ফলে ইসলাম বিচ্ছিন্ন ধর্মে পরিণত হয়।

সংগঠন ও আন্দোলন

সংগঠনের উদ্দেশ্য একামতে দ্বীন। যে সংগঠন বা জামায়াতের উদ্দেশ্য একামতে দ্বীন নয় সে সংগঠন রাসূলের (সঃ) সেই সংগঠনের দাবী পূরণ করতে পারে না। একামতে দ্বীনের জন্য প্রয়োজন 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লার।' মোমিনের এ ধরনের ভূমিকার কথা কুরআন উল্লেখ করেছে এভাবে—"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও জিহাদ করেছে"। ঈমান দিয়ে যার সূচনা জিহাদ দিয়ে তার চুড়ান্তকরন। শুরু হল ঈমান দিয়ে কিন্তু পরিসমাপ্তিতে জিহাদের কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেলনা এমন কোন ইসলামের নাম গন্ধ কুরআন হাদীসে পাওয়া যায় না।

ঈমানের পরবর্তী কর্মসূচী পরিষ্কার ভাষায় পাওয়া যায় একটি হাদীসে। আল্লার নবী বলেনঃ

'আমি তোমাদিগকে পাঁচটি জিনিষের আদেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে উক্ত পাঁচটি জিনিষের আদেশ দিয়েছিলেন, জামায়াত গঠন, (নেতার হুকুম) শোনা ও মানা, হিজরত করা এবং আল্লার পথে জিহাদ করা।' বস্তুতঃ এ হাদীসে একদিকে যেমন সংগঠনের গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে অপরদিকে সংগঠন কি জন্য তাও পরিষ্কার ভাবে পাওয়া যাচ্ছে। এ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, মোমিনদের প্রাথমিক দায়িত্বই হলো সংগঠন ভূক্ত হওয়া এবং নেতার আনুগত্য করা। সংগঠনের অপরিহার্যতা ও সংগঠন পরিচালনা পদ্ধতি প্রথম ৩টি কথায় প্রকাশ করার পর পরবর্তী ২টি বিষয়ে সংগঠনের কর্মসূচীর কথা বলা হয়েছে। এর প্রথমটি হলো ইসলামের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বা ইসলামের বিপরীত সকল কিছু ত্যাগ ও কোরবানী বা হিজরত এবং দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহর পথে জিহাদ বা আন্দোলন। তাই সংগঠনের উদ্দেশ্য হলো জিহাদ বা আন্দোলনের মাধ্যমে ইকামতে দ্বীন।

আন্দোলনের জন্যই সংগঠন। তাই আন্দোলন না থাকলে সংগঠনের কোন গুরুত্ব বা প্রয়োজন থাকে না। আন্দোলন মানে গতি। গতির কারণে যেমন সাইকেল দাঁড়িয়ে থাকে, নদী থাকে নাব্য—গতিবেগ বন্ধ হয়ে গেলে সেই সাইকেল আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা, এক দিকে হেলে পড়ে যায় এবং নদীর স্রোতধারা বন্ধ হয়ে গেলে তা আর নদী থাকেনা, পরিণত হয় বালুচরে—তেমনি যতদিন ইসলামে গতি বা আন্দোলন থাকে ততদিন ইসলামের একামত থাকে, আর আন্দোলন না থাকলে ইসলাম বহুমুখী ভেজালে পরিণত হয়। তখন সংগঠনও হয়ে পড়ে অকেজো অথবা বলা যায় সংগঠনের নিষ্ক্রীয়তার কারনেই আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী যুগে সংগঠন ও আন্দোলন টিকে থাকেনি ফলে ইসলামও পূর্ণাঙ্গভাবে কায়েম থাকেনি। তাই আন্দোলন ও সংগঠন ছাড়া ইসলামের একামত সম্ভব নয়।

সংগঠনের দুর্বলতা ও মজবুতি

সংগঠন গড়ে উঠে কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রগতি না হলে সংগঠনের যথার্থ মূল্য নেই। এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন বা উদ্দেশ্য সাধন নির্ভর করে সংগঠনের মজবুতি বা নিষ্ক্রীয়তার উপর। সংগঠনের মধ্যে দুর্বলতা থাকলে উদ্দেশ্য সাধন বা তার অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই ভাল করে দেখা দরকার সংগঠনের দুর্বলতা কোন কোন দিক থেকে বা কোন কোন কারণে আসে। এসব দুর্বলতা দূর করে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারলেই সংগঠনের মজবুতি আসবে।

সংগঠনের আলোচনার প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা দেখছি চারটি উপাদানের ভিত্তিতে সংগঠন চলে। যথাঃ (১) একক উদ্দেশ্য (২) নেতৃত্ব (৩) কর্মীবাহিনী ও (৪) কর্মসূচী। সংগঠনের এই ৪টি মৌলিক উপাদানের এক বা একাধিক উপাদানে দুর্বলতা দেখা দিলেই সংগঠনে দুর্বলতা দেখা দিবে। তাই আমরা এক একটি উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখব কি ধরণের দুর্বলতা এক একটিতে সৃষ্টি হতে পারে।

একক উদ্দেশ্য

আদর্শিক আন্দোলন ও সংগঠনে উদ্দেশ্যের ঐক্য গড়ে উঠে আদর্শের ভিত্তিতে। তাই আদর্শের দিক থেকে কোন দুর্বলতা থাকলে সংগঠনে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে।

ইসলামী আদর্শের প্রবর্তক বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তায়ালা। অহীর ভিত্তিতে রচিত আলকুরআন ও রাসূলের সুন্নাতের সমষ্টিই হল ইসলাম। এর ভিতর নেই কোন দুর্বলতা, নেই কেন খণ্ডিত বা ত্রুটি। কিন্তু এই আদর্শকে ভিত্তি করে যারা সংগঠনে শরীক হয় তাদের আদর্শকে গ্রহন করা, মানা, বুঝা এবং প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

১। আদর্শ গ্রহণ ও মানার ক্ষেত্রে ত্রুটি

সাধারণ ভাবে মুসলমান সমাজ, বিশেষ ভাবে ইসলামী সংগঠনে জড়িত জনশক্তি ইসলামী আদর্শ গ্রহন ও মানার ক্ষেত্রে ব্যাপক ত্রুটি বা দুর্বলতা প্রদর্শন করে থাকে। ব্যক্তিগত ভাবে ইসলামের সাথে সাথে অন্যান্য আদর্শ যেমন বস্তুবাদ, ভোগবাদ বা আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদকেও গ্রহন করে এবং তার ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করে। কেউ বা ইসলামকে তার বিস্তৃত ময়দান থেকে গুটিয়ে গুটিকয়েক ব্যক্তিগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। কেউবা ইসলামকে কায়েমের জন্য আল্লাহর পথে জিহাদের ধারনাকে পাল্টিয়ে কেবলমাত্র আত্মশুদ্ধির জিহাদ বা ব্যক্তিগত সংশোধনবাদে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। ফলে আদর্শের মাধ্যমে যে একক উদ্দেশ্য সৃষ্টি হওয়ার কথা সে একক উদ্দেশ্য সৃষ্টি হয় না। এমনিভাবে সংগঠনের মূল উদ্দেশ্যই বানচাল হয়ে যায়।

২। আদর্শ বুঝা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে ত্রুটি

আদর্শ গ্রহণ ও মানার ক্ষেত্রে যা ত্রুটি তা আসলে হয়ে থাকে আদর্শকে সঠিক ভাবে বুঝা ও অনুধাবন না করার কারণে। মুসলিম সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী অধঃপতনে আজ পতনোন্মুখ। সাধা-

রণ মুসলমান তো দূরের কথা, আলেম-ওলামা পর্যন্ত কুরআন হাদীস অধ্যয়নে অনভ্যস্ত। সর্বত্র কুরআন হাদীসের গভীর চর্চার অভাব। ফলে কুরআন হাদীসের মূল স্পিরিট থেকে মুসলমান সমাজ চলে এসেছে বহু দূরে। কুরআন হাদীসকে সমাজে বাস্তবায়নের মহান শ্লোগান নিয়ে কাজ করার বিরাট দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামী সংগঠনে জড়িত ব্যক্তিবর্গও সম্পূর্ণ সজাগ নন। যারা আন্দোলন ও সংগঠনে লেগে আছেন তাদেরও অনেক সময় দেখা যায় দায়সারা গোছের ভাবে লেগে আছেন। সংগঠনের নেতার নিকট আত্মসমর্পনের প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত উপলব্ধি করেন না অনেকে।

৩। আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংকল্পের ত্রুটি

আদর্শ গ্রহণ, মানা ও বুঝার ত্রুটির কারনেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার যে সংকল্প ইসলামী সংগঠনের জনশক্তির মধ্যে সৃষ্টি হওয়ার কথা সে সংকল্প সৃষ্টি হচ্ছে না। আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠনের জনশক্তির মধ্যে এক অদম্য সংকল্প এবং তদানুযায়ী চেষ্টা সাধনা সৃষ্টি হওয়া দরকার। কিন্তু জনশক্তির বোধশক্তি যেন তেমন তীব্র নয়, অনেকটা যেন ভোতা। যার ফলে জনশক্তির মধ্যে কোন সংকল্পেরই সৃষ্টি হচ্ছে না। কাজ করে যাওয়া দরকার তাই কাজ হচ্ছে রুটিন মাফিক। ইসলামী বিপ্লব কোন রুটিন ওয়ার্কের ফলাফল নয়। এর জন্য প্রয়োজন মজবুত সংকল্প ও কঠোর সাধনার। জনশক্তির মধ্যকার এ ত্রুটি খুবই মারাত্মক ত্রুটি। এ ত্রুটি কাটিয়ে উঠতে না পারলে সংগঠনের দুর্বলতা দূর করা যাবে না।

নেতৃত্ব

ইসলামী সংগঠনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নেতৃত্ব। এই নেতৃত্ব শুধু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নয় বরং কেন্দ্র থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে জিলা, উপজিলা, ইউনিয়ন ও ইউনিট পর্যন্ত যে নেতৃত্বের সিল সিলা রয়েছে এই গোটা নেতৃত্ব কাঠামোকেই বুঝায়। কোন আন্দোলন বা সংগঠনে নেতৃত্বই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। নেতৃত্বই আন্দোলনের ডাক দেয়,

সাড়াদানকারী জনশক্তিকে সংগঠিত করে, তাদের মান উন্নত করে আন্দোলনে গতি ও আবেগ সৃষ্টি করে। সংগঠনে নেতাকে ইঞ্জিনের ভূমিকা পালন করতে হয়। ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়লে যেমন গাড়ীই হয়ে পড়ে অচল তেমনি নেতৃত্ব নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়লে গোটা আন্দোলনই থেমে যায়। সংগঠনও হয়ে যায় লন্ডভন্ড। তাই নেতৃত্বের স্বয়ংক্রীয়তা, সক্রীয়তা ও উদ্যোগী ভূমিকা সংগঠনের মূল চালিকা শক্তি। ফলে এ উপাদানে দুর্বলতা সৃষ্টি হলে সংগঠন দুর্বল হবেই। এ পর্যায়ে কি কি ধরনের দুর্বলতা আসতে পারে আলোচনা করে দেখা যাক।

১। নেতৃত্বের মধ্যে উদ্যোগের অভাব

নেতৃত্ব মানেই উদ্যোগী ভূমিকা। ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে দায়ী ইলাল্লার অগ্রনী ভূমিকা নিয়েই কাজ শুরু করতে হয়। সর্বস্তরেই এ উদ্যোগী ভূমিকা প্রয়োজন। যেখানে নেতৃত্বের মধ্যে এই উদ্যোগী ভূমিকা নেই সেখানেই দেখা দেয় নেতৃত্বের দুর্বলতা। এ দুর্বলতা গোটা সংগঠনকেই দুর্বল করে রাখে।

২। যোগ্যতা ও কর্মতৎপরতার অভাব

ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্বের জন্য বিভিন্নমুখী যোগ্যতার প্রয়োজন। যে কোন পর্যায়ে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যোগ্যতার কমতি থাকলে সংগঠনে বিভিন্ন মুখী জটিলতা সৃষ্টি হয়। যোগ্যতার অভাবের কারনে যেমন সংগঠনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয় তেমনি যোগ্যতা মোটামুটি থাকা সত্ত্বেও কর্মতৎপরতার অভাব থাকলেও দুর্বলতা দেখা দেয়। নেতা যদি হয় নিষ্ক্রীয় তবে সংগঠন কিভাবে চলতে পারে ? তাই যোগ্যতা ও কর্মতৎপরতার অভাব সংগঠনে দুর্বলতা সৃষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩। মনযোগ ও সময়ের অভাব

সংগঠন চায় সংগঠনের প্রতি নেতার পূর্ণ মনযোগ। পূর্ণ নিষ্ঠা ও মনযোগ সহ নেতা সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলে সংগঠন মজবুত হবে স্বাভাবিক ভাবেই। এর জন্য নেতাকে যথেষ্ট সময়

দিতে হবে। নেতা যদি তার সময়ের বেশীর ভাগই নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন পূরনে ব্যস্ত থাকেন তা হলে সংগঠনের দাবী পূরন নাও হতে পারে। তাই নেতার পক্ষ থেকে সংগঠনের প্রতি যদি পূর্ণ মনযোগ দেয়া না হয় এবং নেতার প্রয়োজনীয় সময় যদি সংগঠনের কাজে না আসে,তাহলে সংগঠনে দুর্বলতা দেখা দিবে।

৪। সার্বিক ব্যবস্থাপনার প্রতি নজর না দেয়া

নেতাকে আন্দোলন ও সংগঠনের কাজের সকল দিকের সকল বিষয়ের প্রতি পূর্ণ নজর রাখতে হয়। এটা নেতৃত্বের এক পবিত্র দায়িত্ব। বাড়ীর কর্তাকে যেমন বাড়ীর সকলের সকল বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হয় তেমনি নেতাকেও হতে হয় সজাগ। যিনি সফলভাবে পরিবারের সকল বিষয়ের খেয়াল ও তদারক করেন তিনিই যেমন আদর্শ কর্তা তেমনিভাবে সংগঠনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম সম্পর্ক যে নেতৃত্ব খবরদারী করেন তিনিই আদর্শ নেতা। কোন নেতা এ ধরনের খেয়াল খবর না রাখলেই সংগঠনে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। তাই সংগঠনে দুর্বলতার একটি অন্যতম কারণ সংগঠনের কাজের সার্বিক ব্যবস্থাপনার প্রতি নেতার নজর না রাখা।

৫। পরিকল্পনা ভিত্তিক কাজ না করা

সংগঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যেমন নেতৃত্বের অন্যতম দায়িত্ব তেমনি নেতার ব্যক্তিগত কাজও হওয়া দরকার পরিকল্পনা ভিত্তিক। যে নেতা পরিল্পনা ভিত্তিক কাজ করতে পারে না, পীরকল্পনা বাস্তবায়নও তার দ্বারা সম্ভব নয় এবং এমতাবস্থায় সংগঠনে মারাত্মক ত্রুটি ও অব্যবস্থা দেখা দেয়। তাই পরিকল্পনা ভিত্তিক কাজ না করা সংগঠনের একটি দুর্বলতা।

৬। গুছিয়ে কাজ করতে না পারা

নির্দিষ্ট পদ্ধতির ভিত্তিতে কাজকে সুষ্ঠভাবে গুছিয়ে করতে হবে অর্থাৎ কাজের মধ্যে শৃংখলা বজায় থাকবে। বৈঠক পরিচালনার ক্ষেত্রে শৃংখলার প্রশ্ন রয়েছে, সপ্তাহের বৈঠক সমূহের ব্যাপারে শৃংখলার প্রশ্ন

আছে—এই ভাবে সমস্ত ব্যাপারে কাজ সমূহকে নির্দিষ্ট পদ্ধতির ভিত্তিতে গুছিয়ে আঞ্জাম দিতে না পারা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি বিরাট দুর্বলতা।

৭। দায়িত্ব পালনে অমনোযোগিতা বা অবহেলা

নেতৃত্বের কতকগুলো বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে, সেগুলো তাদেরকেই আঞ্জাম দিতে হয়। যেমন বৈঠক ডাকা, বৈঠকে অধস্তন সংগঠন থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র বুঝে নেয়া, রিপোর্ট পর্যালোচনা, অধস্তন সংগঠনের তদারক, প্রাপ্তব্য জিনিষের তাগীদ তলব—ইত্যাদি বিষয়ে দায়িত্বশীলকে অবশ্য সজাগ ও সক্রীয় থাকতে হবে। অন্যথায় সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই দায়িত্বশীলের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অমনোযোগীতা বা অবহেলা সংগঠনে দুর্বলতার একটি বড় কারণ।

৮। অধস্তন সংগঠনের দায়িত্ব শীলের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্কের দুর্বলতা

অধস্তন সংগঠনের দায়িত্বশীলের নিকট থেকে কাজ আদায় করা নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ ব্যাপারে তাকে অধস্তন সংগঠনের দায়িত্বশীলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। মাসিক বৈঠকে অধস্তন দায়িত্বশীলের যোগদান এবং অধস্তন সংগঠনের বৈঠকে উর্দ্ধতন দায়িত্ব শীলের যোগদান এবং বিশেষ খবরাখবরের মাধ্যমে এ সম্পর্ক সর্বদা চালু থাকে। এ সম্পর্কের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিলে সংগঠনে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

৯। সহকর্মী ও অধিনস্থদের সাথে সুসম্পর্ক না থাকা

ইসলামী আন্দোলনে নেতা ও কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ও আন্তরিক হবে এটাই স্বাভাবিক। এর ব্যতিক্রম হলেই সংগঠনে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে বুঝতে হবে। নেতৃত্ব ও সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হয় সাধারণতঃ কয়েকটি কারণে।

(১) দায়িত্বশীলের কঠোর ও কর্কশ ব্যবহার, সহকর্মী বা অধস্তন দায়িত্বশীলের কোন ত্রুটি বিচ্যুতিকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা, এর জন্য কর্কশ ভাষায় আজে-বাজে মন্তব্য করার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে কষ্ট পেলে সম্পর্কের অবনতি হবে। এতে করে সংগঠনে দুর্বলতার যে বীজ বপন করা হল ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়তে পারে।

(২) পারস্পরিক পরামর্শ ছাড়া নেতা একা একা কাজ-কর্ম করতে থাকলেও সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য সহকর্মীগণ কাজে কোন উৎসাহ পায়না এবং মনের আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা নিয়ে কাজ করতে পারেনা। ফলে সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে একটি চাপা ক্ষোভ বিরাজমান থাকে। এতে সংগঠনে দুর্বলতা দেখা দেয়।

(৩) কারো ব্যাপারে কোন মোহাসাবা থাকলে তা নিয়ম মাফিক সমাধা না করলেও জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। উল্টাপাল্টা মোহাসাবার কারণে সংগঠনের আভ্যন্তরীণ পরিবেশটাই হয়ে উঠতে পারে ভারী। নেতৃত্বের যথার্থ ভূমিকা না থাকলে সংগঠনের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

সহকর্মী ও অধীনস্থ দায়িত্বশীল ও কর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক না থাকলে সংগঠনে মৌলিক দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

১০। সহকর্মীদেরকে তৈরী ও বিকল্প নেতৃত্বসৃষ্টি করতে না পারা

নেতৃত্বের একটি বিশেষ কাজ হলো সহকর্মীদিগকে কাজে লাগানো, তাদের মান উন্নত করা এবং তাদেরকে গড়ে তোলার সাথে সাথে তাদের মধ্য থেকে যোগ্যতর ব্যক্তিকে নেতৃত্বের দায়িত্বে বসানোর জন্য বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলা। কোন নেতা যদি এ কাজটি করতে না পারেন তবে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা ব্যর্থ। তাই সহকর্মীদেরকে গড়ে তোলা এবং বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে না পারা সংগঠনের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি বিরাট দুর্বলতা।

কর্মীবাহিনী

সংগঠনের তৃতীয় উপাদান কর্মীবাহিনী। কর্মীবাহিনীই সংগঠনের প্রাণ। একটি সদাসতর্ক ও সদাতৎপর কর্মীবাহিনীর মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবের কাজ এগিয়ে যেতে পারে দ্রুত গতিতে। আর উৎসাহ উদ্দীপনাহীন, অযোগ্য ও কর্মবিমুখ একটি কর্মীবাহিনী আসলে কোন কর্মীবাহিনীই নয়। হযরত মূসা (আঃ) এর সংগী সাথীরা যেমন তাকে বলেছিলেন, "তুমি এবং তোমার খোদা যাও লড়াই করগে, আমরা তো এখানে বসলাম" —এমন কর্মীবাহিনী দ্বারা সংগঠনের কোন ভবিষ্যত নেই। এ ব্যাপারে যেসব বিষয়ে দুর্বলতা আসতে পারে তা নিম্নে আলোচনা কর হল।

১। আদর্শের জ্ঞানের অভাব, সংগঠনের দাবী না বুঝা

কর্মীদের মধ্যে আদর্শের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব থাকার কারণে কর্মীর দায়িত্ব সম্পর্কে তারা সজাগ নন। আসলে একামতে দ্বীনের দায়িত্ব মুসলমানদের জন্য একটি অপরিহার্য ফরজ—এ বিষয়টি আজকের মুসলমান এবং আমাদের কর্মীদের নিকট সুস্পষ্ট নয়। যারা আন্দোলনে শরীক হয়েছেন তারাও এটাকে নফল হিসাবে পালন করার চেষ্টা করেন। ফলে কর্মীদের মধ্যে যে স্বতস্ফূর্ততা, তৎপরতা ও প্রাণ চাঞ্চল্য পাওয়ার কথা তা পাওয়া যাচ্ছে না। সংগঠনের দৃষ্টিতে এ এক বিরাট দুর্বলতা।

২। গভীর ও আন্তরিক পারস্পরিক সম্পর্কের অভাব

কর্মীদের মধ্যে গভীর পারস্পরিক সম্পর্ক সংগঠন মজবুত করণের এক বিরাট শক্তি। ভালবাসা ও মহব্বত ছাড়া এ শক্তি অন্য কোনভাবে অর্জন করা যায় না। কর্মীদের মধ্যে সেই ধরণের মজবুত সম্পর্ক না থাকা সংগঠনের দুর্বলতার লক্ষন। সংগঠনের জন্য এও একটি মৌলিক দুর্বলতা।

৩। কর্মীদের মধ্যে টিম স্পিরিটের অভাব

সংগঠনের একেক পর্যায়ের কর্মীগণ বা একেক এলাকার কর্মীগণ

এক একটি টীম। তাদেরকে টীম স্পিরিট নিয়ে কাজে নামতে হবে। টীম স্পিরিট নিয়ে কাজে নামতে পারলেই কাজে গতি সৃষ্টি হবে। কর্মীদের মধ্যে টীম স্পিরিটের অভাব সংগঠনের একটি বিশেষ দুর্বলতা।

৪। যথারীতি কর্ম বণ্টন না হওয়া

কর্মীকে তার যোগ্যতানুসারে কাজ ভাগ করে দিতে হবে। কর্মীদের মধ্যে কর্মবণ্টন না হলে কর্মীগণ যথারীতি কাজে মনযোগী হতে পারে না এবং সংগঠনের কাজে দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

৫। কর্মীদের মান বৃদ্ধি না পাওয়া

কর্মীদের মধ্য থেকেই রুকন ও দায়িত্বশীল সৃষ্টি হয়। এজন্য প্রয়োজন কর্মীদের মান ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করা। কর্মীদের মান যদি মোটেও বৃদ্ধি না পায় তাহলে বুঝা যায় সংগঠনের কাজ যথারীতি চলছে না অর্থাৎ সংগঠনে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে।

কর্মসূচী

সংগঠনের চতুর্থ উপাদান কর্মসূচী। জামায়াতে ইসলামীর ৪ দফা স্থায়ী কর্মসূচী রয়েছে। সংগঠনের কর্মসূচী সংক্রান্ত দুর্বলতা কি কি আসতে পারে নিম্নের আলোচনায় আমরা তা দেখব।

১। দায়িত্বশীলগণ কর্তৃক কর্মসূচীকে ভাল করে না বুঝা

দায়িত্বশীলগনের মধ্যে অনেকেই ৪ দফা কর্মসূচীকে সঠিক ও যথার্থ ভাবে বুঝবার চেষ্টা করেন না।

(ক) দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিশ্ববাসী, সাধারণ মুসলমান, শিক্ষিত জনগণ এই বিভিন্ন স্তরের লোককে বিভিন্ন ধরনে দাওয়াত পেশ।

(খ) সাড়া প্রদানকারীদেরকে সংগঠনভুক্ত করন ও প্রশিক্ষণ দান এবং যার মোতাবেক গড়ে তোলা।

(গ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও সমাজ সেবা।

(ঘ) রাষ্ট্রীয় সংশোধনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ময়দানে সৎ ও যোগ্য লোকের নেতৃত্ব কায়েম।

এই দফাগুলো সঠিকভাবে বুঝে সবগুলির যথার্থ গুরুত্ব সহকারে দায়িত্ব পালন না করলে সংগঠনে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে।

২। ৪ দফা কর্মসূচীর ক্ষেত্রে ভারসাম্য না রাখা

সংগঠনের জনশক্তি ও অর্থশক্তির মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচীতে ৪টি দফায় ভারসাম্য না থাকলে সংগঠনের কাজে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো দায়িত্বশীলের মধ্যে কতক অতি সাংগঠনিক আবার কতক অতি রাজনৈতিক। সাংগঠনিক চরিত্রের দায়িত্বশীল রাজনৈতিক কাজকর্মকে অযথা হৈ চৈ এবং বাজে কাজ মনে করেন আবার রাজনৈতিক চরিত্রের দায়িত্বশীল সাংগঠনিক এইসব খুটি নাটি কাজকে অহেতুক পোকাবাছার কাজ মনে করেন। সংগঠনের প্রয়োজনে এ দুই চরিত্রের দায়িত্বশীলকেই সমন্বয়কারীর ভুমিকায় আসতে হবে। এভাবে কাজে ভারসাম্য আনতে না পারা সংগঠনের জন্য দুর্বলতা।

৩। কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বায়তুলমাল সংগ্রহ করতে না পারা

কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বায়তুলমাল প্রয়োজন। তাই বায়তুলমাল সংগ্রহ করনের পদক্ষেপও সংগঠনকেই নিতে হবে। কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বায়তুলমাল সংগৃহীত না হাওয়া সংগঠনের একটি বিশেষ দুর্বলতা।

৪। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়া

৪ দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংগঠন বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহন করে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি বিশেষ উদ্যোগ ও ব্যবস্থা

গ্রহন করা দরকার। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়া মানে সংগঠনের একটি দুর্বলতা।

সংগঠনের দুর্বলতা কোন কোন দিক থেকে এবং কি কি ভাবে আসতে পারে আমরা আলোচনা করে দেখলাম। আমাদের আলোচনায় প্রথম উপাদানে ৩টি, ২য় উপাদানে ১০টি, ৩য় উপাদানের ৫টি এবং ৪র্থ উপাদানে ৪টি সর্বমোট ২২টি কারণ ধরা পড়লো। হয়ত আরো ২/৪টা কারণ থাকতে পারে। তবে এই ২২টি দুর্বলতার দিক ঠিক করে সংগঠনকে দাঁড় করাতে পারলে সংগঠনে মজবুতি আসবে আশা করা যায়। সামনে আমরা সংগঠনের মজবুতি আসবে কি ভাবে এ বিষয়ে আলোচনা রাখব।

সংগঠনের মজবুতি আসবে কিভাবে

সংগঠনের দুর্বলতা যেমন সংগঠনের উপাদানের মাধ্যমেই সংগঠনে আত্মপ্রকাশ করে তেমনি ভাবে সংগঠনের মজবুতিও তার উপাদানের মাধ্যমেই আসবে। মনে রাখতে হবে সংগঠনের ৪টি উপাদানের মধ্যে উদ্দেশ্যের ঐক্য ও কর্মসূচী ধরাছোঁয়ার বাইরের জিনিষ। তাই নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনীই মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। সংগঠনের মজবুতিও আসে এ দুই উপাদানের মাধ্যমে, দুর্বলতাও সৃষ্টি হয় এ দুইয়ের কারনেই। সংগঠনের মজবুতি আমাদের কাম্য। মজবুতি আনতে হলে দুর্বলতার কারণগুলো দূর করতে হবে। দুর্বলতা দূর করে সাথে সাথে যে সব পদক্ষেপ নিলে সংগঠন মজবুত হবে সেগুলো হলো নিম্নরূপ।

১। উদ্দেশ্যের ঐক্য সাধনে আদর্শকে পূর্ণভাবে গ্রহণ

ইসলামী আন্দোলনের জন্য গঠিত সংগঠনের গোটা জনশক্তির একটি উদ্দেশ্য—আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এ উদ্দেশ্যের ধারনাকে সুস্পষ্ট করার জন্য কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা দরকার। গোটা জনশক্তি যদি এব্যাপারে তৎপর হন তবে আদর্শকে যেমন যথার্থ ভাবে গ্রহন করা যাবে তেমনি উদ্দেশ্যের ঐক্যও সৃষ্টি হবে।

এর সাথে আদর্শকে যেমন গ্রহণ করতে হবে একটি পূর্নাঙ্গ দ্বীন হিসাবে তেমনি বাস্তব জীবনেও আদর্শকে পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। যদিও রাষ্ট্রীয় ভাবে দ্বীন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ সম্ভব নয়।

২। আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রানান্তকর প্রচেষ্টা

সংগঠনে অংশগ্রহণকারী জনশক্তিকে সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ করে তুলতে হবে এবং চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সংকল্পের দৃঢ়তা এবং চূড়ান্ত ও প্রানান্তকর প্রচেষ্টা কামিয়াবীর এক মজবুত শর্ত। সংগঠনের জনশক্তিকে এ ব্যাপারে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। এ ধরণের একটি জনশক্তি সংগঠনের মজবুতির প্রথম সোপান।

৩। উদ্যোগী নেতৃত্ব বা নেতৃত্বের উদ্যোগী ভূমিকা

সংগঠনের মজবুতির জন্য উদ্যোগী নেতৃত্ব অথবা নেতৃত্বের উদ্যোগী ভূমিকা অপরিহার্য। উদ্যোগী নেতৃত্ব যখন সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, সংগঠন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। নেতা যখন অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে যান, সংগঠনও তখন হয়ে উঠে বেগবান। স্বয়ংক্রীয় ও সক্রীয় নেতাই সংগঠনের পরিচিতি এনে দেয়। তাই, সংগঠনের মজবুতির জন্য উদ্যোগী নেতৃত্ব হলো প্রধান হাতিয়ার।

৪। কর্ম তৎপর ও যোগ্য নেতৃত্ব

নেতৃত্বকে হতে হবে কর্মতৎপর, কর্মচঞ্চল, দায়িত্বানুভূতি সম্পন্ন, দায়িত্ব পালনকারী এবং সাথে সাথে যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প নেই। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নেতৃত্ব হয়ত অনেক সময় পাওয়া যাবে না কিন্তু ইসলামী সংগঠন পরিচালনার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকেই নেতৃত্বের দায়িত্বে বসাতে হবে। যোগ্যতা সম্পন্ন ও কর্মতৎপর নেতৃত্ব সংগঠনের মজবুতি বয়ে আনবে আশা করা যায়।

৫। সংগঠনের প্রতি মনযোগ ও সময় দিতে সক্ষম

যোগ্যতা সম্পন্ন নেতৃত্ব যদি সংগঠনের প্রতি যথার্থ মনযোগ দেন, সংগঠন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, সংগঠনের অগ্রগতির জন্য পেরেশানী অনুভব করেন তাহলে সংগঠন মজবুতির দিকে ধাপে ধাপে এগুবে এতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য মনযোগের সাথে সাথে সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও দিতে হবে। নেতৃত্বকে যেভাবেই হোক প্রয়োজনীয় সময় বের করতেই হবে।

৬। সার্বিক ব্যবস্থাপনার প্রতি খেয়াল রাখা

নেতাকে অবশ্য সংগঠনের সার্বিক দিক ও বিভাগের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। সংগঠনের প্রতিটি খুটিনাটি ব্যাপারও নেতৃত্বের জানা থাকবে এবং সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধানের যেমন সে ব্যাপারে সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হয় তেমনি নেতাকেও সংগঠনের ব্যাপারে সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। সংগঠনের মজবুতির জন্য নেতার এ ধরনের সার্বিক দায়িত্ব পালন জরুরী।

৭। পরিকল্পনা ভিত্তিক কাজ আঞ্জাম দান

নেতাকে পরিকল্পনা মাফিক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের যেমন খেয়াল থাকবে নেতার তেমনি তার নিজের কাজও হবে পরিকল্পনা মাফিক। সংগঠনের মজবুতির ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিকল্পনা মাফিক কাজ ফলপ্রসূ হবে।

৮। শৃংখলা মোতাবেক গুছানো কাজ

সংগঠনের মজবুতির জন্য সংগঠনের প্রতিটি কাজই হওয়া দরকার সাজানো-গুছানো ও শৃংখলা মোতাবেক। বিশৃংখল কাজে কোন বরকত নেই। যে কোন কাজেরই পূর্ব পরিকল্পনা থাকবে, দায়িত্ব ভাগ-বন্টিত থাকবে এবং সুষ্ঠু পরিচালনা থাকবে আর প্রোগ্রাম শেষে প্রয়োজন বোধে তার পর্যালোচনা হবে। এমনি শৃংখলা মোতাবেক কাজ হলে সংগঠনের মজবুতি না এসে পারে না।

৯। দায়িত্ব পালনে দায়িত্বশীলের সতর্কতা ও মনযোগ

সংগঠনের বিভিন্নমুখী দায়িত্ব দায়িত্বশীলের পালন করতে হয়। সকল

ব্যাপারে দায়িত্বশীলকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে এবং যথারীতি দায়িত্ব পালন করতে হবে। বৈঠকাদি ডাকা, যথাসময়ে বৈঠক শুরু করা এবং যথারীতি পরিচালনা, অধস্তন সংগঠনের যথারীতি তদারক, রিপোর্ট গ্রহণ ও পর্যালোচনা, অধস্তন সংগঠনের মাসিক রিপোর্ট ও নেছাব যথাসময়ে আদায় ইত্যাদি সকল বিষয়ে দায়িত্বশীলকে খেয়াল রাখতে হবে। এমনি ভাবে খেয়াল রেখে নেতৃত্ব যদি দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের মজবুতি অনিবার্য।

১০। অধস্তন সংগঠনকে সক্রিয় ও সচল রাখা

সংগঠন হলো একটি চেইন ওয়ার্ক অর্থাৎ এক স্তরের সাথে অন্য স্তরের কাজ সম্পর্কিত। উর্ধতন সংগঠনের নেতৃত্বের দায়িত্ব হলো নিম্নস্থ সংগঠনের দায়িত্বশীলকে সর্বদা চাঙ্গা করে রাখা, কাজ করানো, রিপোর্ট আদায় ইত্যাদি। উর্ধতন দায়িত্বশীল নিম্নস্থ দায়িত্বশীলের কাজ (ক) তদারক করবেন, ভুলত্রুটি সংশোধন করে দেবেন, ঠিকভাবে কাজ করার তরীকা বাৎলে দেবেন; (খ) কাজের রিপোর্ট নেবেন, যথার্থ রিপোর্ট যাতে আসে সেদিকে খেয়াল রাখবেন ও পূর্নাঙ্গ রিপোর্ট নেবার চেষ্টা করবেন; (গ) রিপোর্টের যথাযথ পর্যালোচনা করবেন, ত্রুটি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন (ঘ) কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান করবেন। নতুন দায়িত্বশীলকে হাতে-কলমে রিপোর্ট তৈরী, বৈঠক পরিচালনা এসব শিখতে হয়—এভাবে সহযোগিতা করবেন। এভাবে নিম্নস্থ সংগঠনের সাথে বিভিন্ন কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে নিম্নস্থ সংগঠনকে সক্রিয় ও সচল করে তুলতে হবে এবং চালু রাখতে হবে। একটি জীবন্ত ও মজবুত সংগঠনের নমুনাই এরূপ।

১১। সহকর্মী ও নিম্নস্থ দায়িত্বশীলদের সাথে গভীর ও আন্তরিক সম্পর্ক থাকা

সংগঠনের মজবুতির আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে নেতৃত্বের এবং কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক গভীর ও আন্তরিক সম্পর্ক। নেতাকে যদি কর্মীগণ অন্তর দিয়ে ভালবাসেন তাহলেই তো তিনি ইসলামী সংগঠনের সত্যিকার নেতা। এ ক্ষেত্রে নেতাকে যেসব গুনাবলীর অধিকারী হতে হবে পূর্বে তার আলোচনা হয়েছে, এখানে সংক্ষেপে পয়েন্টগুলো উল্লেখ করছি। তার

ব্যবহার মন আকর্ষণকারী হতে হবে, পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে, প্রয়োজনবোধে নিয়ম মাফিক মোহাসাবা করে সংগঠনের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ সুস্থ রাখতে হবে।

১২। লোক তৈরী করা ও বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টি

সংগঠনের মজবুতি নির্ভর করে বেশী বেশী দায়িত্বশীল লোক তৈরীর উপর। কোন নেতৃত্ব যদি তার অধীনে নতুন লোক তৈরী করতে পারেন তাহলে সংগঠন মজবুতির পক্ষে এগুচ্ছে বুঝায়। এমনিভাবে কোন দায়িত্বশীল যদি তার স্থলাভিষিক্ত তৈরী করতে পারেন তাহলে তা তার সাফল্য। এমতাবস্থায় বুঝা যায় সংগঠনের মজবুতি এসেছে, কেননা, বর্তমান দায়িত্বশীল না থাকলেও সংগঠন যথারীতি চালু থাকবে।

১৩। স্বতঃস্ফুর্ত ও কর্মতৎপর কর্মীর সমাবেশ

সংগঠনের গতি আনে কর্মীবৃন্দ। সংগঠনের মজবুতি অনেকখানি নির্ভর করে কর্মীদের স্বতঃস্ফুর্ত ভূমিকার উপর। নেতার অঙ্গুলী নির্দেশে কর্মীবৃন্দ যদি কাজে ঝাপিয়ে পড়েন, তৎপরতা পুর্ণোদ্যমে অব্যাহত রাখেন, তাহলে সংগঠন হয়ে উঠে জীবন্ত, আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়। কর্মীদেরকে কর্মঠ ও বিরামহীনভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত হতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের কাজ কোন মওসুমী কাজ নয়, এ কাজ সর্বক্ষনের। সাহাবায়ে কেরামের উদাহরণকে সামনে রেখে কর্মীদেরকে তাদের ভূমিকা রাখতে হবে।

১৪। কর্মীদের মধ্যে টিম স্পিরিট তৈরী

কর্মীদের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে একটি Team spirit গড়ে তুলতে হবে। এ যেন একটি মেশিন। মেশিনের যেমন সংগুলো কলকব্জা একযোগে কাজ শুরু করে এবং একটি অপরটির সহায়তা করে তেমনি সংগঠনের কর্মীদেরকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। এমনি Team spirit নিয়ে কাজ করলে বুঝা যাবে সংগঠনে মজবুতি এসেছে।

১৫। যোগ্যতার সাথে স্ব স্ব কাজ করা ও মানবৃদ্ধি

কর্মীদের প্রত্যেককে সংগঠন কর্তৃক দেয়া স্ব স্ব কাজ যোগ্যতার সাথে

পালন করতে হবে। সংগঠন পূর্ব থেকেই প্রত্যেক কর্মীকে তার যোগ্যতানুযায়ী কাজ বন্টন করে দেবে। কর্মীগন স্ব স্ব ময়দানে যোগ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মীমান বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকবেন। কর্মী থেকে অগ্রসর কর্মী ও রুকন হবেন এবং দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এমনিভাবে যোগ্যতার সাথে দায়িত্বপালন ও মান বৃদ্ধি পেলে সংগঠনের মজবুতি আশা করা যায়।

১৬। নেতা ও কর্মীগন কর্তৃক কর্মসূচী ভাল করে বুঝে কর্মসূচী আঞ্জাম দান

দায়িত্বপালন ও কাজ করার জন্য কর্মসূচীকে ভাল করে বুঝে নিতে হবে। ৪টি দফার কাজকে একই সাথে একযোগে পরিচালনা করতে হবে। দাওয়াতের ফলাফল সংগঠনে অধিক লোক যোগদানের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটাতে হবে। সংগঠনে যোগদানকারী লোকদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সংগঠিত জনশক্তিতে পরিনত করতে হবে। সংগঠিত জনশক্তি দ্বারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটানো এবং অধিক পরিমানে সমাজ সেবার কাজ করাতে হবে। সাথে সাথে চলমান রাজনৈতিক ময়দানে যথার্থ ভূমিকা রাখতে হবে। এমনিভাবে ৪ দফা কাজের ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত কাজের আঞ্জাম দিতে হবে।

১৭। পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

৪ দফা কাজকে সামনে রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কেন্দ্র থেকে ইউনিট পর্যন্ত যথার্থ পরিকল্পনা নিতে হবে এবং পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজের বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যথারীতি পর্যালোচনা ও নতুন পদক্ষেপ নিতে হবে। এমনিভাবে পরিকল্পনা মাফিক ধাপে ধাপে কাজ এগিয়ে নিতে পারলে সংগঠনের মজবুতি আসবে।

১৮। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ

সংগঠনের মজবুতি আনতে হলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। সংগঠনের ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এ প্রয়োজন পূরণে প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে সংগঠনে জড়িত ব্যক্তিবর্গকেই। তারা তাদের সাধ্যমত আল্লার পথে দানে অংশ-

গ্রহণ করবেন, সহযোগীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করবেন, আন্দোলনের শুভাকাংখী মহল থেকে অর্থ সংগ্রহ করবেন। জাকাত, ওশর, মওশুমী কালেকশন ইত্যাদির মাধ্যমে এক মজবুত বায়তুল মাল গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে বায়তুল মালের যথাযথ ব্যবহারও করতে হবে। বাজেটের খাত অনুযায়ী হিসাব করে খরচ করতে হবে। বায়তুলমালের যথাযথ হিসাব নিকাশ রাখতে হবে।

উপরে যে সব পয়েন্ট আলোচনা করা হল এভাবে সংগঠনকে গড়ে তুলতে পারলে এক মজবুত সংগঠন গড়ে তোলা যাবে আশা করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। সংগঠনের দুর্বলতাগুলো দূর করে সার্বিকভাবে এক মজবুত সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করার মধ্যেই নির্ভর করে আন্দোলনের ভবিষ্যত।

সংগঠনের মজবুতির লক্ষণ

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকলে বুঝা যাবে সংগঠনের মজবুতি রয়েছে এবং সংগঠন অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

১। চিন্তার ঐক্য

বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুর ব্যাপারে যদি ঐক্যমত দেখা যায় তাহলে বুঝা যাবে সংগঠনের মজবুতি রয়েছে। অবশ্য এ কথা দ্বারা এটা বুঝায় না যে কোন ব্যাপারে কোন মতপার্থক্যই থাকবে না। মানুষের সংগঠনে মত পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আলোচনান্তে যে ফায়সালা হবে সে ফায়সালা যদি সবাই মেনে নেন তাহলেই চিন্তার ঐক্য রয়েছে বলে ধরা হবে।

২। সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার ত্বরিৎ বাস্তবায়ন

কোন ইস্যু আসলে যথারীতি সে ব্যাপারে ফায়সালা দিতে হবে এবং ফায়সালা মোতাবেক ত্বরিৎ পদক্ষেপ নিতে হবে। সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের এ ধরনের ত্বরিৎ বাস্তবায়ন হলে বুঝা যাবে সংগঠন যথেষ্ট মজবুত। দুর্বল সংগঠনে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহন ও সাথে সাথে তার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অথবা এধরনের ত্বরিৎ পদক্ষেপ সম্ভব না হলে তা মজবুত সংগঠন নয়।

৩। জনশক্তির মানের ক্রম বৃদ্ধি

রুকন, কর্মী ও সহযোগী সদস্য যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাহলে বুঝা যায় সংগঠনের কাজ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। রুকন ও কর্মীদের মান যদি ঠিক থাকে তাহলে জনশক্তি বৃদ্ধি পাবেই। আর যদি দেখা যায় রুকন ও কর্মী সংখ্যা বাড়ছে না তাহলে বুঝা যাবে মান ঠিক নেই। এমতাবস্থায় যথার্থ হিসাব নিলে দেখা যাবে, কিছু সংখ্যক কর্মী যথার্থ প্রশ্নে কর্মী নেই।

৪। বায়তুলমাল বৃদ্ধি

সংগঠনের অগ্রগতি হলে বায়তুল মাল বৃদ্ধির মাধ্যমেও তা প্রকাশ পাবে। সংগঠনের অগ্রগতি মানে জনশক্তি বৃদ্ধি এবং জনশক্তি বৃদ্ধি পেলে স্বাভাবিকভাবেই বায়তুলমাল বেড়ে যাবে। তাই জনশক্তি ও বায়তুলমাল বৃদ্ধির মাধ্যমে সংগঠনের অগ্রগতি পরিস্কার ভাবে ধরা পড়বে।

৫। সংগঠনের আভ্যন্তরীণ সুস্থ পরিবেশ

সংগঠনের মজবুতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও সকল পর্যায়ের জনশক্তির মধ্যে মহব্বত ও ভালবাসার সম্পর্ক থাকার কারণে উন্নত মানের সম্পর্ক বজায় থাকা। এটা নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ পরিবেশ সুস্থ থাকার উপর। যার ফলে টীম স্পিরিট গড়ে উঠে, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি হয়। অথবা এই সম্পর্ক ভাল থাকার কারনেই আভ্যন্তরীণ পরিবেশটি সুস্থ থাকে।

এ সব বিষয়ের মাধ্যমে সংগঠনের মজবুতি এবং অগ্রগতির হার সহজেই নিরূপন করা যায়।

ইসলামী বিপ্লব

কোন সংস্কার বা সংশোধনবাদের নাম বিপ্লব নয়, বিপ্লব হলো কোন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। হালে বিপ্লব কথাটিকে খুবই হালকা করে বলা হলেও (যেমন খালকাটা বিপ্লব, সবুজ বিপ্লব ইত্যাদি) প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব শব্দ দ্বারা কোন বিরাট কাজকেই বুঝায়।

চলমান দুনিয়ায় বহু রক্তক্ষয়ী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। এর ফলে হয়েছে ক্ষমতার হাতবদল বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন। এছাড়া আরেক ধরনের বিপ্লব হতে পারে—তা হলো আদর্শিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন।

ইসলাম একটি জীবন্ত আদর্শ। কিন্তু আমাদের বর্তমান মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা পরিপূর্ণ ইসলাম মোতাবেক নয়। কিছু কিছু ইসলামী মূল্যবোধ সমাজে কায়েম থাকলেও ইসলামী মূল্যবোধের বিরাট অংশ আজকের মুসলিম সমাজে কায়েম নেই। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ইসলামের সার্বিক জীবন ব্যবস্থার রূপায়ন অর্থাৎ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের নাম ইসলামী বিপ্লব। এটারই কোরআনী পরিভাষা হলো ইকামতে দ্বীন। মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ-তায়ালা বলেছেন—ادخلوا فى السلم كافة।

'তোমরা ইসলামের মধ্যে পুরোপুরী দাখিল হয়ে যাও।'

ইসলামের কিছু মানা, কিছু না মানা— যেভাবে আজকে আমরা চলেছি— এতে মানুষের মুক্তি নেই— না ইহকালে না পরকালে। তাই ইসলামী শরীয়ত বা বিধানের পরিপূর্ণ অনুসরণ দরকার। ইসলামী সমাজ কায়েম না থাকলে কোন ব্যক্তির পক্ষে ইসলামের এই পরিপূর্ণ অনুসরণ সম্ভব নয়। তাই কোন ব্যক্তি বা সমাজের লোকদের ইসলামের অনুসরণের জন্য প্রয়োজন ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। সমাজে ইসলাম কায়েম থাকলেই ইসলামের অনুসরণ সম্ভব। তাই কোরআনের কিছু মানা আর কিছু না মানা নয় বরং পরিপূর্ণ কোরআন মেনে চলার মত সমাজ গড়ার নাম ইসলামী বিপ্লব সাধন।

ইসলামী বিপ্লব মানে হুকুমতে ইলাহিয়া বা খেলাফতে ইলাহিয়া কায়েম। হুকুমতে ইলাহিয়া বা খেলাফতে ইলাহিয়ার অর্থ আল্লাহর হুকুম আহকাম বা আল্লাহর খেলাফত সমাজের মধ্যে পুরোপুরি চালু হওয়া। কোরআন ঘোষণা করছে—ان الحكم الا لله। হুকুম কেবলমাত্র আল্লাহর। কোরআন আরো বলছে—له الخلق والامر। 'সৃষ্টিও তাঁর হুকুমতও তারই।' তাই আল্লাহর সৃষ্ট যেই সমাজে কেবলমাত্র আল্লাহরই হুকুম চলে, অন্য যাবতীয় হুকুম হয় আল্লাহর হুকুমের অধীন, সেই সমাজে ইসলামী বিপ্লব চালু হয়েছে বা রয়েছে বলে ধরা যায়।

ইসলামী বিপ্লব মানে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ— আমার বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকার। কুরআন নির্দেশ দিচ্ছে—

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر

"তোমাদের মধ্যে অবশ্য এমন একটি দল থাকবে যারা কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।" বস্তুতঃ সমাজের লোকদের মধ্যে সৎ কাজের প্রচলন এবং অসৎ, খারাপ ও নির্লজ্জ-অশ্লীল কাজ বন্ধ করনের মধ্যেই নিহীত রয়েছে সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা। এই আদেশ ও নিষেধের জন্য প্রয়োজন একটি চুড়ান্ত ক্ষমতার। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমেই সৎ কাজকে সমাজে চালু করতে হবে এবং অসৎ ও খারাপ কাজ বন্ধ করতে হবে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ ও খারাপ কাজের নিষেধ জারী হলেই ইসলামী বিপ্লব কার্যকর হয়েছে বলে বুঝা যায়। কুরআন ঘোষণা করছে—

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

"তোমরাই হচ্ছ শ্রেষ্ঠ জাতি, গোটা দুনিয়ার মানুষের কল্যাণে তোমাদের উদ্ভব, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ কর।" এটাই ইসলামী বিপ্লবের কর্মসূচী এবং এর বাস্তবায়নই ইসলামী বিপ্লবের কার্যকর নমুনা।

ইসলামী বিপ্লব মানে সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি ও আল্লাহর গোলামী ও দাসত্ব কবুল করানো। আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণের জন্য প্রয়োজন শয়তান তথা তাগুতের দাসত্ব বর্জন। কুরআন ঘোষণা করছে, তার অনুসারীদের কাজ হচ্ছে—

ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

আল্লাহর দাসত্ব এবং তাগুতের অস্বীকৃতে। অর্থাৎ ইসলামী বিপ্লব সাধিত হলে সমাজে যে শয়তানের রাজত্ব চলছে তার অবসান হবে

এবং সর্বক্ষেত্রে চালু হবে আল্লাহর গোলামী ও দাসত্ব। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও তামদ্দুনিক জীবনে, সংস্কৃতি-সভ্যতায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, আইন-আদালতে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, শাসন ক্ষেত্রে, যুদ্ধ-সন্ধি, আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে তাগুতি বিধানের পরিবর্তে খোদায়ী বিধান চালু হবে এবং এভাবে আল্লাহর দাসত্ব সর্বক্ষেত্রে কায়েম হবে। সাথে সাথে হবে আল্লার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি। লাইলাহা ইল্লাল্লাহর ঘোষণায় সর্বপ্রকার সার্বভৌম শক্তিকে অস্বীকার করে আল্লাহর চূড়ান্ত সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাই সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও দাসত্ব চালু হলেই বুঝা যাবে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ইসলামী বিপ্লব

হযরত আদম (আঃ)-এর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যুগে যুগে দেশে দেশে আল্লাহ তায়ালা অগনিত আম্বিয়ায়ে কেরামকে ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। তারা সবাই তাদের দায়িত্ব যথারীতি পালন করেছেন। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি ও সমাজের লোকদের ভূমিকার কারণে ফলাফল হয়েছে বিভিন্ন ধরনের। উল্লেখ্য, তাদের সকলেরই বাণী ও দাওয়াত ছিল একই। সবাই একই বিপ্লবী কলেমার ঘোষণা দিয়েছেন—লাইলাহা ইল্লাল্লাহ—আল্লাহ ছাড়া নেই কোন চূড়ান্ত বা সার্বভৌম শক্তি, যাকে মানা যায়—একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত।

তাদের দাওয়াত ও ছিল অভিন্ন। সকল নবীই সমাজের লোকদের নিকট দাওয়াত পেশ করেছেন এই বলে

يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره .

'হে আমার কওমের লোকেরা, তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব কবুল কর, কেননা তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।'

লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে, একই কালেমা, একই দাওয়াত, একই আল্লাহ প্রেরিত নবীদের মাধ্যমে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে আল্লারই সৃষ্টি মানুষের নিকট পৌঁচেছে কিন্তু আল্লাহর প্রেরিত নবী দের প্রতি দুনিয়ায় মানুষ একই রূপ ব্যবহার করেনি। কুরআন থেকে জানা যায়—

(১) কতক নবীকে তদানীন্তন সমাজের মানুষ নবীদের দাওয়াতের কারণে মোটেই বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না এবং তারা শেষ পর্যন্ত তাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর নবীদেরকে হত্যা করেছে। আল্লাহর নবী হযরত জাকারিয়া (আঃ) সহ বনীঈসরাইলের নবীদেরকে এমন ভাবে হত্যা করা হয়েছিল বলে কুরআন থেকে জানা যায়। এই সব নবীগণ সমাজের মানুষের মধ্যে এমন সংখ্যক লোকও যোগাড় করতে পারেননি বলে বুঝা যায়, যারা নবী এবং তাদের স্বপক্ষ লোকদেরকে প্রতিরোধ শক্তির মাধ্যমে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহও সে ধরণের ব্যবস্থা গ্রহন করেননি।

(২) বেশ কিছু সংখ্যক নবীর উদাহরণ কুরআনে রয়েছে যারা দাওয়াতের মাধ্যমে মুষ্ঠিমেয় লোক তো পেয়েছিলেন কিন্তু সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠী ও জনসাধারণ তাদের ডাকে সাড়া দেননি বরং সম্ভাব্য সকল প্রকারে নবীদের বিরোধিতা করেছে। চুড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা নবী ও তার সাথীদেরকে হেফাজত করে বাকীদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। হযরত নুহ (আঃ), হুদ (আঃ), লুত (আঃ), শোয়াইব (আঃ), ছালেহ (আঃ) এসব নবীদের কওমের লোকদের ধ্বংস করা হয়েছে।

এসব নবীদের সংগী সাথীদেরও নিজেদেরকে রক্ষা করার মত প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিলনা। আল্লাহ তায়ালা কুদরতি সাহায্যের মাধ্যমে তাদেরকে হেফাজত করেছেন।

(৩) হযরত ইউনুস (আঃ)-এর উম্মতের ঘটনা হয়েছে কিছুটা ব্যাতিক্রম ধর্মী। এ উম্মতও নবীকে মানেনি। নবী নিরাশ হয়ে আযাব আসন্ন মনে করে আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই উম্মতকে ছেড়ে চলে যান। উম্মতের লোকজন একথা জানতে পেরে যখন বুঝতে পারে আযাব আসন্ন তখন তওবা করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেন।

(৪) এমন নবীর উদাহরণও রয়েছে যারা উম্মতের মধ্যে দাওয়াত দিলে বেশ কিছু লোক তার সাথী হন কিন্তু সমাজের প্রভাবশালী কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ও জনসাধারণ দাওয়াত কবুল করলনা। আল্লাহ নবীকে তার অনুসারী দল সহ অন্যত্র হিজরত করার ফায়সালা দিলেন এবং হিজরতের পর ইসলাম কায়েম হল এবং ইসলামী সমাজ গঠিত

হল। এভাবে ইসলামী বিপ্লব কামীয়াব হল। এ ধরণের নবী হলেন হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)।

হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাইলদেরকে নিয়ে মিসর থেকে হিজরত করে ফিলিস্তিন এলাকায় চলে এলেন। ফেরাউনকে আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রে ডুবিয়ে মারলেন। মূসা (আঃ) এর উম্মত নবীর সাথে অনেক বেয়াদবী পূর্ণ ব্যবহার করেছে, শেরেক লিপ্ত হয়েছে, নবীর সাথে বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হতে অস্বীকার করেছে।

কিন্তু নবী করীম (সঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে যাবার পর তার অনুসারীদেরকে তৈরী করেছেন এবং কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করে আল্লাহর সাহায্যে বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করে ইসলামকে কায়েম করেছেন। মক্কা বিজয়ের পর আরবের সকল বিরোধী শক্তি রাসূলুল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করে এবং ইসলাম গ্রহন করে। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সময় ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঙ্গী-সাথীগণ সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের সাথে হযরত মূসার (আঃ) উম্মতের ন্যায় বেয়াদবী পূর্ণ কোন আচরণ করেননি বরং উৎকৃষ্ট সহযোগীর পরিচয় দিয়েছেন। তারা রাসূলকে অন্তর দিয়ে ভালবেসেছেন, সদা সর্বদা পূর্ণ আনুগত্য করেছেন, রাসূলের আহবানে হিজরত করেছেন এবং যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। সবর, তায়াক্কুল, আল্লার পথে দান ও ইসারের (অন্যকে অগ্রাধিকার দান) গুনে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। তাই তাদের ব্যাপারে কুরআন ঘোষণা ঘোষণা করেছে—'আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর ব্যাপারে সন্তুষ্ট।"

এমন গুণ সম্পন্ন একটি উম্মত যখন রাসূলের সাথী হয়ে বাতিল শক্তির মোকাবিলা করেছে তখন আল্লাহর সাহায্য এসেছে তাদের প্রতি। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা বাতিলকে নির্মূল করে ইসলামের বিজয় দান করেছেন। ফলে ইসলামী বিপ্লব পূর্নত্ব লাভ করেছে।

৫। এমন কিছু নবীর উদাহরণও কুরআনে পাকে রয়েছে যারা তাদের দাওয়াত ও ভূমিকার কারনে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ সহ সমাজের সাধারণ জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করে ইসলামী হুকুমাত কায়েম করেছিলেন। এসব নবীগণ হলেন হযরত

ইউসুফ (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সোলাইমান (আঃ)। এসব নবীদেরকে বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় মজবুত কোন ভূমিকা পালন করতে হয়নি। তাই এসব নবীগণ তাদের দাওয়াত ও অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে সাথে নিয়েই ইসলামী বিপ্লব সাধন করেন।

পৃথিবীর মানচিত্রে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামক দেশটির আত্মপ্রকাশ। ইতিপূর্বে এ এলাকাটি পাকিস্তানের অংশ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান নামে অভিহিত ছিল। ১৯৪৭ সালে মুসলিম সংখ্যা গুরুদেশ হিসাবে দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিতে দেশটির জন্ম। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এলাকার জনগণের ঈমান আকিদার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ৬ দফার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের পূর্ব পাকিস্তান বিরোধী ভূমিকার প্রতিকারের কথাই বলা হয়েছিল। সেদিন সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের শ্লোগান দেয়া হয়নি বরং শেখ মুজিবুর রহমান স্থানে স্থানে বলেছিলেন তিনি ক্ষমতায় গেলে কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন তৈরী করবেন না। ৭০ এর নির্বাচনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী সীট না পেলেও দ্বিতীয় বৃহত্তর দল হিসাবে ভোটের মাধ্যমে স্বীকৃতি পায়।

নির্বাচনের পর পাকিস্তানী শাসকদের হটকারী সিদ্ধান্তের কারণে ৭১এ যুদ্ধ বিগ্রহের পর যে বাংলাদেশ গঠিত হয়। দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য নতুন কোন নির্বাচন হয়নি বরং ৭০ এর নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদেরকে নিয়ে গঠিত পরিষদই শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র সহ ৪ মূলনীতিকে সন্নিবেশিত করে। নিঃসন্দেহে এ ৪ মূলনীতি জনগনের ঈমান-আকিদার প্রতীক ছিলনা। শাসনতন্ত্র ধর্মের নামে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল গঠনকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু কালের চক্রে এ ৪ মূলনীতি টেকেনি। শাসনতন্ত্রের ৫ম সংশোধনীতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বদলে 'আল্লাহর উপর ঈমান ও আস্থা' এবং সমাজতন্ত্রের বদলে 'সামাজিক সুবিচার অর্থে সমাজতন্ত্র'—এ ধরণের সংশোধনী পাশ হয়। ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল গঠনের সংশোধনীও পাশ হয়। জিয়াউর রহমান সাহেব এ সংশোধনী গণভোটে দেন এবং এবং গণভোটেও তা পাশ হয়।

পাকিস্তানী আমল থেকেই জামায়াতে ইসলামী এদেশে কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহর দাসত্ব ও ইসলামী বিপ্লবের আহবানে এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোক সাড়া দিয়েছে। ইসলামী আদর্শ সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে। শুধু ওয়ায়েজীনগনই লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে ইসলামের দাওয়াত রাখেননা বরং সরকারী কর্তাব্যক্তিগণও হর হামেশা—'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, নবীর আদর্শই শান্তি ও কল্যাণ আনতে পারে'—এসব কথা বলে থাকেন। জনগনকে শান্তনা দেয়ার জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম এ ঘোষণাও শাসনতন্ত্রের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে দেয়া হয়েছে।

১৯৮৬ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী যেখানেই অংশগ্রহন করেছে, জনগণের পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া গিয়েছে। চরম ভোট ডাকাতির মধ্যেও অনেকগুলি সিটে জামায়াত নির্বাচনে জয়লাভ করে। এর কয়েকটিতে মিডিয়া ক্যু করার পরও জামায়াতকে দশটি সীটে বিজয়ী বলে ঘোষণা করতে হয় এবং জামায়াত সংসদে পার্লামেন্টারী পার্টি গঠন করতে সক্ষম হয়।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লবের অবস্থা, ১৩ বছর মক্কায় অবস্থানকারী রাসূলের সময়ের মত নয়। সেখানে কায়েমী স্বার্থের সাথে জনগণও ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীতায় লিপ্ত হয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ ইসলামী আন্দোলনের সাথে সেভাবে বিরোধীতায় লিপ্ত নয়। বরং এটা বুঝা যায়, সঠিকভাবে দাওয়াত ও গণসংযোগ করতে পারলে এ দেশের জনগণ সহজেই ইসলামী আন্দোলনের সহযোগী শক্তিতে পরিণত হবে। কিন্তু কায়েমী স্বার্থ—তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় যে মহলেরই হোক না কেন, ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীতা করবে এবং করছে। তাই বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব সাধন করতে হলে কায়েমী স্বার্থের সাথে লড়াই একেবারেই স্বাভাবিক। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় হিজরতের পর একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে বাতিল শক্তির মোকাবিলা করেছিলেন। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনকে নিজ অবস্থানে থেকেই সে লড়াই করতে হবে। সে লড়াই হবে বিভিন্ন ফ্রন্টে—সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে, বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে, মিছিল-সমাবেশের আকারে, নির্বাচনী লড়াইয়ের মাধ্যমে। হয়তবা সশস্ত্র লড়াইও হতে পারে। এসব লড়াইয়ের ময়দানে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী যোগ্যতার পরিচয় দিতে পার-

লেই এদেশে ইসলামী বিপ্লবের সফলতা আশা করা যায়। অবশ্য এদেশে ইসলামী বিপ্লবের কামিয়াবীর জন্য আরো দু'টি দিক উল্লেখ যোগ্য।

(১) বিরোধী শক্তির মোকাবিলার জন্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্য থেকে এমন একটি প্রতিরোধ বাহিনী তৈরী করতে হবে যাতে স্বার্থকভাবে বিরোধী শক্তির আঘাত প্রতিরোধ করে ময়দানে টিকে থাকা যায়।

(২) ইসলামী বিপ্লব সফল হলে বিপ্লবকে ধারন করার জন্য ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন একদল যোগ্য লোক তৈরী করতে হবে যাতে সমাজের প্রত্যেক স্তরে ও প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র ইসলামী আদর্শের ছাচে ঢালাই করে গড়ে তুলতে পারে।

ইসলামী বিপ্লবের শর্ত

১। ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের আন্দোলন

মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব সাধন সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ও তার পরবর্তী ইতিহাস তার প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ। ইসলামী বিপ্লবের জন্য ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের এক জোড়ালো আন্দোলনের প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সঃ) ও কুরআনে পাকের মাধ্যমে সে কথাই জানিয়ে দিয়েছেন মুসলিম সমাজকে। এ ব্যাপারে প্রথমে বলা হয়েছে রাসূলের দায়িত্ব হলো দুনিয়ায় ইসলামের বাস্তবায়ন।

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

"তিনিই সেই সত্বা যিনি রাসূলকে হেদায়াত ও দ্বীনে হক দিয়ে এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যেন তিনি দ্বীন (ইসলাম) কে সকল কিছুর (মতবাদের) উপর বিজয়ী করতে পারেন।" (সূরা আস্‌সাফ: ৯)

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের উপর বাতিলের বিরুদ্ধে জেহাদ করাকে ফরজ করেছেন।

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله باموالكم وانفسكم

"তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখ এবং আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ কর।' (সূরা আস্‌সফঃ ১০)

কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে এই জেহাদ হলো মুসলমানদের সর্বোত্তম আমল। জেহাদের মাধ্যমে বাতিলকে উৎখাত করেই হক (দ্বীন ইসলাম)-কে সমাজে কায়েম করা সম্ভব। বাতিলের সাথে আপোষ করে কোনদিনই হককে কায়েম করা সম্ভব নয়। তাই ইসলামী বিপ্লবের জন্য প্রথম শর্ত হলো ইসলামের বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের সংগ্রাম সাধনা ও সর্বাত্মক চেষ্টা তথা ইসলামী আন্দোলনের।

২। মজবুত সংগঠন

ইসলামী বিপ্লবের জন্য যে জোড়ালো আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার তার জন্য প্রয়োজন এক মজবুত সংগঠনের। সংগঠনে সকল প্রকার দুর্বলতা দূর করে সংগঠনের মজবুতি আনতে হবে। এর জন্য বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, তৎপর ও ত্যাগী কর্মীবাহিনী সহ প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ হতে হবে যা সংগঠন পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

৩। দাওয়াত, আদর্শের স্বীকৃতি ও অনুকূল জনমত

একটি মজবুত সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত একটি জোড়ালো আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত দেশবাসী তথা দুনিয়াবাসীর নিকট সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরতে হবে এবং যাতে সমাজে ইসলামী আদর্শের স্বীকৃতি ঘটে তার পদক্ষেপ নিতে হবে। কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের নিকট পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে তুলে ধরতে হবে। কুরআন-হাদীসের দরস, আলোচনা এবং বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমেও ইসলামের দাওয়াত ও মর্মবাণীকে সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে। এছাড়া ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক গণসংযোগের মাধ্যমে দেশব্যাপী একটি অনুকূল জনমত গড়ে তুলতে হবে। এভাবে ইসলামের বাস্তবায়নকামী জনগণকে একটি সক্রিয় ও সংগঠিত জনশক্তিতে পরিণত করতে পারলে মজবুতভাবে ইসলামী বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।

৪। মান মোতাবেক যথেষ্ট পরিমান লোক তৈরী

ইসলামী বিপ্লবের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আন্দোলন পরিচালনা, জনগণকে সংগঠিত করণ, বিরোধী শক্তির মোকাবেলা করণ, বিরোধী শক্তির মোকাবেলায় প্রতিরোধ সৃষ্টি ও ইসলামী বিপ্লব

ধারন করার জন্য মান মোতাবেক যথেষ্ট পরিমাণ লোক তৈরী। ইসলামী আদর্শের সত্যিকার স্পিরিট অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রের চাহিদা মোতাবেক এসব লোক তৈরী করতে হবে।

এদের মধ্যে থাকবে নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্ব। কেন্দ্র থেকে সর্বনিম্ন ইউনিট পর্যন্ত নেতৃত্বের চেইন সৃষ্টি হবে। কর্মীদের মধ্যে থাকবে সদাতৎপর, ত্যাগী, ছবর, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল আলাল্লাহর গুণসম্পন্ন এক মজবুত ও বিরাট কর্মীবাহিনী। এরা ইসলামী জ্ঞানে হবে পারদর্শী, বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও বাস্তবমুখী কাজে সুদক্ষ, সদাজাগ্রত ও নিবেদিত প্রাণ। সর্বোপরি ইসলামের বাস্তবায়নকামী এই জনশক্তিকে তাদের জান ও মাল দিয়ে ইসলামের বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

লোক তৈরীর এক স্থায়ী প্রোগ্রাম সংগঠনের মধ্যেই থাকতে হবে। ইসলামী বিপ্লবের জন্য তৈরী লোক বিদেশ থেকে আমদানী করা যাবেনা বা রেডিমেট এরূপ লোকও পাওয়া যাবেনা। তাই কুরআন হাদীসের চর্চা, ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন, ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, বিরোধী শক্তির অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করা এবং মোকাবেলা ইত্যাকার কর্মসূচীর মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবের খাঁটি কর্মী তৈরী করতে হবে। এভাবে কর্মীদের ঈমানী, এলমী ও আমলী যোগ্যতা বাড়াতে হবে। ঈমানের মজবুতি, এলেমের গভীরতা ও আমলের নির্মলতার মাধ্যমে উন্নতমানের কর্মী সৃষ্টি হবে। সর্বোপরি আন্দোলনের প্রয়োজনে কর্মীদের জান ও মাল বিলিয়ে দেবার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে।

৫। বলিষ্ঠ, সাহসী ও যোগ্যতা সম্পন্ন নেতৃত্ব

যে কোন বিপ্লবের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন সাহসী নেতৃত্বের প্রয়োজন। যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃত্ব ব্যতীত দুনিয়াতে কোন দিন কোন বিপ্লব সংগঠিত হয়নি। ইসলামী বিপ্লবের জন্যও আদর্শ মাফিক নেতৃত্ব অপরিহার্য। আসলে ইসলামী বিপ্লবের কাজটি হল আম্বিয়ায়ে কেরামের-কাজ। তাই নবীর অবর্তমানে সেই মানেরই নেতৃত্বের প্রয়োজন। তাকে নবীর মতই বলিষ্ঠ ও সাহসী ভূমিকা পালন করতে হবে, নিষ্কলুষ ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, কুরআন হাদিসের জ্ঞানে হতে হবে উন্নত, আচার-ব্যবহারে হতে হবে ভদ্র ও

বিনয়ী, হতে হবে প্রিয়ভাষী, নীতির অনুসরণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে হতে হবে দৃঢ় ও মজবুত।

৬। ত্যাগী ও সদাতৎপর কর্মীবাহিনী

ইসলামী বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন সদাতৎপর একটি কর্মীবাহিনী। মৌসুমী কর্মীদের দ্বারা ইসলামী বিপ্লব সম্ভব নয়। তাদেরকে ত্যাগ ও কোরবাণীতে সাহবায়ে কেরামের অনুসারী হতে হবে। ইসলামী জ্ঞানার্জন ও শরীয়তের বিধিনিষেধ পালনে অনুরাগী হতে হবে। সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত গুণাবলী অর্জন করতে হবে। তাদেরকে স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে আন্দোলনের পথে। তারা হযরত মুসা (আঃ) এর উম্মতের মত নেতার অসহযোগী হবে না বরং আন্দোলনের দাবী অনুযায়ী যথাযথ ভূমিকা পালন করে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম হবেন তাদের সামনে উত্তম উদাহরণ।

৭। প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জন

ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য সংগঠনকে কর্মীদের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের পথে কায়েমী স্বার্থবাদী বিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে আঘাত আসবে এটা স্বাভাবিক। বিরোধী শক্তির এ আঘাত ও প্রতিকূলতার মুখে আন্দোলন ও সংগঠনকে হেফাজত করার মত প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে মদীনায় ইসলামী হুকুমাত কায়েম করার পরও বদর, ওহোদ, খন্দক যুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এমনিভাবে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হওয়ার পূর্বে এবং ইসলামী বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলন, সংগঠন ও ইসলামী রাষ্ট্রকে হেফাজত করার জন্য ইসলামী সংগঠনকে যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

৮। ধারণ ক্ষমতা অর্জন

প্রতিরোধ ক্ষমতার ন্যায় ইসলামী বিপ্লবের জন্য ধারণ ক্ষমতা অর্জনও জরুরী। ধারণ ক্ষমতা প্রয়োজন ইসলামী বিপ্লব সাধিত হওয়ার

পর তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী বিপ্লব এক বিরাট পদক্ষেপ। আধুনিক রাষ্ট্রের যতগুলো বিভাগ আছে সবগুলো বিভাগে আন্দোলনের তৈরী লোক দ্বারা আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর রেডিমেট লোক দ্বারা এ বিরাট কাজ সম্ভব নয়। তাই আন্দোলনের পর্যায় থেকেই বিভিন্ন বিভাগে এ কাজ শুরু করে দিতে হবে। ঐ বিভাগকে ইসলামী ছাঁচে ঢালাইয়ের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক একটি গ্রুপ তৈরী করতে হবে এবং বিপ্লবের পর যোগ্যতার সাথে কর্ম সম্পাদনের প্রস্তুতি নিতে হবে। এভাবে বিপ্লবের পূর্বেই প্রধান প্রধান সকল বিভাগে কাজ শুরু করে দিতে হবে যাতে বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর যোগ্যতার সাথে ঐ সব বিভাগে পরিবর্তন এনে প্রকৃত বিপ্লব ঘটানো যায়।

ইসলামী বিপ্লবের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত— আল্লাহর সাহায্য

ইসলামী বিপ্লবের যে সব শর্ত উপরে আলোচনা করা হল এগুলো মানবীয় প্রচেষ্টা মাত্র, ইসলামী বিপ্লবের প্রকৃত ও চূড়ান্ত শর্ত নয়। ইসলামী বিপ্লবের প্রকৃত শর্ত হলো আল্লাহর সাহায্য।

আল্লাহতায়ালা মুমিন সালেহ বান্দাদেরকে এই দুনিয়ার খেলাফত দানের ওয়াদা করেছেন।

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الارض

“দুনিয়াতে খেলাফত দানের জন্য আল্লাহ তাআলা যে শর্ত আরোপ করেছেন তা হল সত্যিকার ঈমানদার হতে হবে এবং আমলে সালেহ সম্পাদন কারী হতে হবে।” আজকে দুনিয়ার বুকে কোটি কোটি মুসলমান থাকা সত্বেও খেলাফত না থাকাতে বুঝা যায়, আজকের দুনিয়ার মুসলমানগন সত্যিকার ঈমানদার ও আমলে সালেহ সম্পাদনকারী নন। তাহলে প্রকৃত ঈমানদার ও আমলে সালেহ সম্পাদনকারী কে বা কারা

এ কথা ভাল করে বুঝে নিতে হবে এবং একদল মুমেনুন সালেহুন বানাতে হবে।

প্রকৃত ঈমানদার বলতে বুঝায়, আল্লাহর চূড়ান্ত ও প্রকৃত সার্বভৌমত্বসহ কেতাব, রাসূল, ফেরেশতা, আখেরাতের হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি ঈমান পোষণকারী একটি দল। যে ঈমান এই দুনিয়ায় জামায়াতবদ্ধ হয়ে আল্লার দ্বীন কায়েমের তাগীদ দেয়। সে ঈমান শুধু মৌখিক ঘোষনা বা স্বীকৃতিই দেয় না বরং অন্তরের বিশ্বাস সহকারে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তব আমলে তা প্রকাশ করে। সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিধি বিধানই মুক্তি ও কল্যান বয়ে আনতে পারে এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে দুনিয়ায় ইসলাম কায়েমের জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় রত করে।

দুনিয়ার বুকে ঈমানদারদের খেলাফত লাভের জন্য দ্বিতীয় যে শর্ত আল কুরআন পেশ করেছে তা হলো তাদেরকে আমলে সালেহ সম্পাদনকারী হতে হবে। আরবী ভাষায় "সালাহিয়াত" অর্থ যোগ্যতা। এ অর্থে আমলে সালেহ মানে যোগ্যতার সাথে কর্মসম্পাদনকারী অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের বাস্তবায়নের ব্যাপারে যোগ্যতার সাথে সকল কার্য সম্পাদনকারী ঈমানদারদের একটি দল দুনিয়ায় বর্তমান থাকলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার খেলাফত দানের ওয়াদা করেছেন। এই আমলে সালেহকারী মোমিনদের কার্যক্রমের উদাহরণ আলকুরআনের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। সূরা আলে-ইমরানে তাদেরকেই এ মুমিন বলা হয়েছে যারা—

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ
سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا.

"যারা হিজরত করেছে, যাদের বাড়ী ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যারা আমার পথে কষ্ট স্বীকার করেছে এবং লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে।"

বস্তুতঃ আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য এই স্তরগুলো অবশ্য অতিক্রম করতে হবে। এখানে হিজরতের কথা প্রথমে বলা হয়েছে। হিজরতের পূর্বেও কয়েকটি স্তর রয়েছে। তা হলো, ইসলামী আদর্শের

প্রতি ঈমান আনা, এ পথে সমাজের সর্বস্তরের লোকদেরকে আহ্বান জানানো, কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা, অত্যাচার, নির্যাতন অতঃপর আসে হিজরতের প্রশ্ন। হিজরতের সাথে সাথে বাড়ী ঘর ত্যাগ করে আল্লাহর পথে কষ্ট স্বীকার এবং বাতিলের সাথে মোকাবিলা, লড়াই, হত্যা এবং শাহাদত বা বিজয়।

ইসলামী বিপ্লবের পথে আল্লাহর সাহায্য লাভের শর্ত এগুলিই।

সূরা ছফে বলা হয়েছে—

واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

وبشر المؤمنين .

'অপর একটি জিনিস যা তোমরা কামনা কর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং নিকটতম বিজয় এবং মুমেনদের জন্য সুসংবাদ।' এর আগের আয়াতেই বলা হয়েছে—

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله

باموالكم وانفسكم .

'ঈমান আন আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল দ্বারা' তাহলে বিজয়ের জন্য শর্ত হলো জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে চূড়ান্ত জিহাদ।

বদরের ময়দানে এমনি লড়াইয়ে আল্লার সাহায্য আসার কথা আল্লাহ এভাবে জানিয়েছেন—(সূরা আলে ইমরান ১২৩ আয়াত থেকে ১২৬ আয়াত)—

ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم

تشكرون ○ اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمد

كم ربكم بثلثة الف من الملئكة منزلين ○ بلى ان

تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم

بخمسة الف من الملئكة مسومين ○ وما جعله الله

الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا

من عند الله العزيز الحكيم ○

‘ইতিপূর্বে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন অথচ তখন তোমরা খুবই দুর্বল ছিলে। অতএব খোদার না-শোকরী হইতে দূরে থাকা তোমাদের কর্তব্য। আশা করা যায় যে, এখন তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা ঈমানদার লোকদের বলিতেছিলে : তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে আল্লাহ তিন হাজার ফেরেস্তা অবতরণ করাইয়া তোমাদের সাহায্য করিবেন? নিশ্চয়ই তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর, খোদাকে ভয়-ভীতিসহ কাজ কর তবে যেই মুহূর্তে শত্রুগণ তোমাদের উপর চড়াও হইয়া আসিবে ঠিক সেই মুহূর্তে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্ন যুক্ত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিবেন। এই কথা আল্লাহতায়ালা এই জন্য জানাইয়া দিতেছেন যেন তোমরা সন্তুষ্ট হও এবং তোমাদের মন আশ্বস্ত হয়। বস্তুতঃ জয়লাভ ও সাহায্য যাহা কিছু হয় তাহা সবই আল্লার তরফ হইতেই হয়, যিনি বড়ই শক্তিমান ও বিজ্ঞানী।”

বদরের যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ সাহায্য প্রাপ্তির জন্য যে সব শর্ত আরোপ করলেন তা হলো :

(১) না-শোকরী থেকে দূরে থাকতে হবে।

(২) আন্দোলনের যে পরিস্থিতিই থাকুক না কেন বিরোধী শক্তি সম্মুখ সমরে বাধ্য করে ফেললে আল্লাহর শোকর আদায় করে হিম্মত-সহ এগিয়ে যেতে হবে।

(৩) আল্লাহর সরাসরি সাহায্যের আশা পোষণ করতে হবে।

(৪) ধৈর্য ধারণ করতে হবে, পেরেশান বা অস্থির হয়ে দিগবিদিক ছুটাছুটি করে হুলস্থূল করা ঠিক হবে না।

(৫) তাকওয়ার ভিত্তিতে কার্যক্রম চালাতে হবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করতে হবে।

(৬) মনে রাখতে হবে সাহায্য এবং বিজয় কেবলমাত্র আল্লার পক্ষ থেকেই আসতে পারে যিনি সর্বশক্তিমান ও সুবিজ্ঞ।

বদরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে সূরা আনফালে আল্লাহতায়ালা ১০ নং আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم

"সাহায্য কেবল মাত্র আল্লাহর নিকট থেকেই আসে তিনি মহা ক্ষমতা শালী ও সুবিজ্ঞও।"

আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে এমন আশা করা জায়েয নয়। আল্লাহ তাআলা সূরা হজ্জে এ ব্যাপারে শক্ত কথা বলেছেন—

من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخرة

فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر

هل يذهبن كيده ما يغيظ .

'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাহার কোন সাহায্য করিবে না তাহার একটি রশির সাহায্যে আকাশ পর্যন্ত

পেঁৗছিয়া উহাতে ফাটল ধরাইয়া দেয়া উচিৎ। ইহার পর সে দেখুক আহার কৌশল তাহার কোন্ দুঃসহ অপছন্দনীয় জিনিষ প্রতিরোধ করিতে পারে কিনা।'

সূরা তাওবার ৭৪ আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন—

وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير .

'এই দুনিয়ার বুকে তাদের জন্য আর কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।"

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার ও আখেরাতে মোমিন বান্দার বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা—

فاعلموا ان الله مولكم نعم المولى و نعم
النصير

"জেনে রাখ আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং উত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী।" (সূরা আনফাল ৪০)

বদরের যুদ্ধ প্রসংগে সূরা আনফালের ১৭ আয়াতে আল্লাহ নিজে শত্রু শক্তিকে আঘাত করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন—

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . وما رميت
اذ رميت ولكن الله رمى .

"তোমরা তাহাদেরকে হত্যা করোনি বরং আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং যা নিক্ষেপ করেছ তা তুমি নিক্ষেপ করোনি আল্লাই নিক্ষেপ করেছেন।"

উহোদের যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেনঃ

ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه .

"আল্লাহ তাআলা (সাহায্য ও মদদের) যে ওয়াদা তোমাদের নিকট করে ছিলেন তা তো তিনি পূরা করে দিয়েছেন। প্রথমে তাহারই অনুমতিতে তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে।"

কিন্তু অতঃপর আল্লাহর সাহায্য কেন উঠিয়ে নেয়া হল তা সূরা আল ইমরানের ১৫২ আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েক আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে যা বলা হয়েছে তা অবশ্যি মোমিনদের জন্য শিক্ষণীয়। এখানে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো ঃ

(১) তোমরা দুর্বলতা দেখালে।

(২) তোমরা মত পার্থক্য করলে।

(৩) নেতার আদেশ অমান্য করে গনিমতের মালের পেছনে লেগে গেলে।

(৪) তোমাদের মধ্যে কিছু ছিল দুনিয়ার স্বার্থান্বেষী আর কিছু পরকাল কামী।

(৫) আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করলেন কিন্তু মোমিনদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।

(৬) রাসূলের আহবান সত্বেও তোমরা পালায়নপর হয়ে চলে যাচ্ছিলে।

(৭) এ ঘটনার বিশ্লেষণে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছিল এভাবে যে কেউ এখানে না আসলে মারা যেতনা।

এ পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা মোমিনদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে হেদায়াত দান করলেন এবং চূড়ান্ত ঘোষণা শুনালেন সূরা আল ইমরানে ১৬০ আয়াতে।

ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم

فمن ذا الذي ينصركم من بعده . وعلى الله فليتو

كَلِ الْمُؤْمِنُونَ

"আল্লাহ্ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে কোন শক্তিই তোমাদের উপর জয়ী হইতে পারিবে না। আর তিনিই যদি তোমাদিগকে অপদস্থ করেন তবে অতঃপর কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করিতে পারে? কাজেই প্রকৃত মুমিন আল্লাহর উপরই ভরসা রাখে।"

আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে সূরা আহযাবের ৯ আয়াতে বলেন:

يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ
جاء لكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا
لم تروها . وكان الله بما تعملون بصيرا .

"হে ইমানদারগণ তোমাদের প্রতি খোদার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরন করো যখন শত্রু সৈন্য বাহিনী তোমাদের উপর চড়াও হইয়া আসিয়াছিল তখন আমরা তাহাদের উপর এক প্রবল ঝটিকা পঠাইয়া দিলাম এবং তোমরা দেখতে পাওনা এমন এক সৈন্য বাহিনী পাঠাইলাম। আল্লাহ্ তোমরা যা কিছু করিতেছিলে তা দেখিতেছিলেন।"

সূরা তাওবার ২৫ ও ২৬ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين
اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا
وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين
وانزل جنودا لم تروها .

"আল্লাহ ইতিপূর্বে বহু ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করিয়াছেন। এই সেদিন হুনায়েনের যুদ্ধের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্যের অহংকার ও অহমিকা ছিল। কিন্তু তাহা তোমাদের কোন কাজেই আসেনি। যমীন উহার অসীম বিশালতা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গেল। আর তোমরা পশ্চাদাপসারণ করিয়া পালাইয়া গেলে। অতঃপর আল্লাহ্ তাহার শান্তির আমিয় ধারা রাসূল ও ঈমাদনার লোকদের উপর বর্ষণ করিলেন আর এমন এক বাহিনী পাঠাইলেন যা তোমরা দেখিতে পাওনি।" এ পর্যন্ত আমরা বদর, ওহোদ, খন্দক ও হোনাইনের যুদ্ধ প্রসংগে আল্লার সাহায্য ও তা থেকে শিক্ষানীয় বিষয় সমূহ আলোচনা করলাম। এসব আলোচনায় আল্লাহ্ কখন সাহায্য করেন এবং কখন সাহায্য

সংকোচিত করেন তার উল্লেখ পাওয়া গেল। কোরআনে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির কিছু সরাসরি শর্তেরও উল্লেখ রয়েছে। সূরা হজ্জের ৪০ আয়াতে বলা হয়েছে : ولينصرن الله من ينصره .

"আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করিবেন যে আল্লাহকে সাহায্য করিবে।" সূরা মুহাম্মদের ৭ আয়াতে বলেছেন :

يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم
ويثبت اقدامكم

"হে ঈমানদার বান্দাগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের পদ সমূহকে দৃঢ় মজবুত করিয়া দিবেন।" সূরা সফে বলা হয়েছে :

يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله .

"হে মোমিনগণ আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও।" বস্তুত আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়া বা আল্লাহর সাহায্য করা মানে আল্লাহর দ্বীনের বা একামাতে দ্বীনের তথা ইসলামী আন্দোলনের সাহায্যকারী হওয়া। সূরা হজ্জের ৬০ আয়াতে বলা হয়েছে : ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله .

"যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নিবে, যেরূপ তাহাদের প্রতি করা হইয়াছে অতঃপর যদি তাহার উপর বাড়াবাড়ি করা হয় তবে আল্লাহ অবশ্যই তাহার সাহায্য করিবেন।" কাফেরদের অত্যাচার নির্যাতনের মোকাবিলায় চূড়ান্ত পর্যায়ে মোমিনদেরকে রক্ষা করার ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করেছেন :

كذلك ننج المؤمنين

'এমনিভাবে আমি মোমিনদেরকে রক্ষা করি।' তেমনি মোমেনদেরকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব বলে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে :

ولقد حق علينا نصر المؤمنين .

"এবং অবশ্য মোমিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য।"

ইসলামী আন্দোলনের বিজয় বা ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য আল্লার সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। সূরা সফে বলা হয়েছে :

واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب
وبشر المؤمنين .

"অপর একটি জিনিষ (ইসলামী বিপ্লব) যা তোমরা কামনা কর তা আল্লার সাহায্য, আসলে বিজয় অতি নিকটে, মোমিনদের জন্য সুসংবাদ।"

সূরা ফাতহের ২০ আয়াতেও অনুরূপ সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدى الناس عنكم ولتكون اية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.

আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল সংখ্যক ধন সম্পদ (গনিমত) দান করিবার ওয়াদা করিতেছেন যাহা তোমরা অবশ্যই লাভ করিবে। তড়িৎভাবেই তো এই বিজয় তিনি তোমাদিগকে দিলেন। আর লোকদের হস্ত তোমাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হওয়া হইতে বিরত রাখিলেন। ইহা যেন মোমিনদের জন্য একটি নিদর্শন হইয়া উঠিতে পারে। আল্লাহ তোমাদেরকে সরল সোজা পথের হেদায়াত দান করেন।"

আল্লাহ উত্তম সাহায্যকারী হিসাবে বিরোধী শক্তির মনে ভয় ও আতংক সৃষ্টি করে দিবেন এমন কথাও বলা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ১৫০, ১৫১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

بل الله مولكم وهو خير النصرين.

'বরং আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।' এরপর বলা হইয়াছে ঃ

سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب

"শিগগীরই সে সময় আসিবে, তখন কাফেরদের মনে ভয় ও ভীতি সৃষ্টি করিয়া দিব।" আল্লাহর এই সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ দোয়া শিখিয়ে দিয়েছিলেন তার নবীকে ঃ

رب اجعلنى من لدنك سلطانا النصيرا

"হে আমার রব, আমাকে তোমার পক্ষ থেকে একটি সাহায্যকারী রাজশক্তি দান কর।" আল্লাহর এই সাহায্য ও বিজয়ই ইসলামী বিপ্লবের চাবিকাঠি। যা আল্লাহ তাআলা সূরা নসরে বলেন ঃ

اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون فى دين الله افواجا.

'যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় আসে তখন দেখতে পাবে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হইয়াছে।'

আল্লাহর এই সাহায্য ও বিজয় লাভের মৌলিক কর্মসূচী সূরা সফে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো ঃ

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله

باموالكم وانفسكم .

"তোমরা দৃঢ় ভাবে ঈমান পোষণ কর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল দ্বারা।"

ইসলামী বিপ্লবের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের জন্য বহু শর্ত ও গুনাবলীর কথা উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে আমরা জানতে পারি।

বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। (১) মোমিনরা একটি মজবুত দল যা নেতার আদেশ মেনে চলবে এবং পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে। (২) সে দলটি এমন শক্তি অর্জন করবে যা বিরোধী শক্তি তাদের জন্য হুমকি মনে করে অত্যাচার নির্যাতন করেই কেবল ক্ষান্ত হবেনা সরাসরি সশস্ত্র হামলা করতে এগিয়ে আসবে। (৩) বিরোধী শক্তির অত্যাচার নির্যাতনে ধৈর্য অবলম্বন করবে কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে সাধ্যমত মোকাবেলা করবে। (৪) সম্মুখ সমরে কোন রূপ দুর্বলতা দেখাবে না। (৫) যে কোন পরিস্থিতিতে নেতার আদেশে ময়দানে টিকে থাকবে। কোন অবস্থাতেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। (৬) গনীমতের মাল তথা দুনিয়ার সম্পদ লাভের প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব না দিয়ে আখেরাতের কল্যানের দিকে গুরুত্ব প্রদান করবে। (৭) সংখ্যাধিক্যের অহমিকায় যেন পেয়ে না বসে সেদিকে খেয়াল রাখবে। (৮) সর্বঅবস্থায় আল্লাহর সাহায্যের কামনা করবে। (৯) সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলবে। (১০) কেবলমাত্র আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল বা ভরসা করবে।

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন আজ কায়েমী স্বার্থের মোকাবেলার মুখোমুখী। এ পর্যায়ে স্বাভাবিক ভাবেই আসবে অত্যাচার, নির্যাতন। সবর ও তাওয়াক্কুলের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে। এবং আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষা করতে হবে। আল্লাহর সাহায্য পেলে জনগণকে সাথে নিয়েই এ দেশের মাটিতে ইসলামী বিপ্লব সাধন করতে হবে। নেতৃবৃন্দকে হতে হবে অত্যন্ত সজাগ ও হুশিয়ার। আল্লাহ তাআলা বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনকে যথারীতি কার্যক্রমের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্যে ইসলামী বিপ্লব সাধনের সুযোগ দান করুন। আমীন।।